Contents

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের দলিল, বৈজ্ঞানিক থিউরি ও যুক্তির আলোকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ,
ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহ নিরসন ও পথভোলা মানুষদের ইসলামে আসার গল্প।

আহ্বান

দ্বীন-আল-ইসলাম
খ্রিস্টান ধর্ম
ইয়াহুদি ধর্ম
বৌদ্ধ ধর্ম
হিন্দু ধর্ম
শিখ ধর্ম
পারসি ধর্ম

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

আহ্বান

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

পরিবেশনায়
ইমাম পাবলিকেশন্স
লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা- ১০০০।
০১৯৫৪৯৪৪৯০৫, ০১৮৭৪-৫০০২২২; ০১৯১২-১৭৫৩৯৬

www.QuranerAlo.com

আহ্বান

সংকলনে :

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল
gazimuhammadtanjil@gmail.com
www.facebook.com/ahoban2017/

বানান ও ভাষারীতিঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা

বইটি অনলাইন অর্ডার করতে ভিজিট করুন
www.facebook.com/ahoban2017/
www.sijdah.com Cell: +8801614-711811
www.alfurqanshop.com Cell +88 01672475769

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :
বাংলাবাজার : ০১৭৪৫৬৩৯৫৮৮, ০১৯১৩৩৭৬৯২৭
বংশাল : ০১৮৫৫৫৬৬৬২৫ ,০১৯১৯৬৫৬ ৯৬,
খুলনা : ০১৯১১০৭৭২০৪, ০১৭১৫৫৯৫০৫৫
নারায়ণগঞ্জ: ০১৭৫১-৮৬৮৬৬২।
রাজশাহী : ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।
সিলেট : ০১৭৮৮-৪৮৫৭২৬।

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৭।

গ্রন্থস্বত্ব : সংকলকের

[বিঃদ্রঃ লেখকের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে প্রিন্ট করে বইটি ছাপানো বা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ ও আইনত দন্ডনীয়। তবে অনলাইনে পিডিএফ শেয়ার করা যাবে]

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র ।

[বিঃদ্রঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি,পরকালিন মুক্তি ও নাজাতের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরনের জন্য পেতে চাইলে প্রকাশনীর/লেখকের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইল।]

Ahoban
Written by Gazi Muhammad Tanjil

Contents

-----এই বইটি পড়ার আগে নিচের প্রশ্নগুলোর দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখুনতো ! ----

১. আমি কে ?
২. আমার সৃষ্টিকর্তা কে ? সৃষ্টিকর্তা কি আসলেই আছেন ?
৩. প্রকৃত (আসল) সৃষ্টিকর্তাকে আমি চিনতে পারছি কি ?
৪. আমি যে ধর্ম (দ্বীন) মানছি এটা কি সঠিক ?
৫. আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি?
৬. আমার কি করা উচিৎ ?
৭. আমি বর্তমানে কি করছি ?
৮. আমাকে কোথায় ফিরে যেতে হবে ?
৯. আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ?
১০. আমাকে কি মৃত্যুর পরের জীবনে অর্থাৎ পরকালে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে ?
১১. আমি মুসলিম হয়েও ইসলাম মানছি না কেন ?
১২. আমি ইসলাম থেকে দূরে কেন ?
১৩. আমি ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জানি ?
১৪. ইসলামের শিক্ষা কি ?
১৫. ইসলাম কি আসলেই সঠিক দ্বীন/জীবনব্যবস্থা/ধর্ম ?
১৬. আমি ইসলাম অনুযায়ী চলছি না কেন ?
১৭. কেন এতগুলো ধর্ম?
১৮. ইসলাম আমাকে কিভাবে চলতে বলে ?
১৯. মুক্তি কোন পথে ?
২০. জীবনের সফলতা আসলে কিসে ?

---------কিছু উপলব্ধি করেছেন কি ?---------

?

www.QuranerAlo.com

Contents

উপহার

আমার,
শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..
....
....
......কে **'আহবান'** বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

নাম...

ঠিকানাঃ ....

সাক্ষর
....
তারিখ
....

বইটি কাদের জন্য ?

- যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও গবেষণা করতে আগ্রহী।
- যারা হক (সত্য) জানতে আগ্রহী। সত্য পথের সন্ধানে গবেষণারত আছেন।
- যারা সত্য দ্বীন (ধর্ম) গ্রহনে ও মিথ্যা বর্জনে আপোষহীন ।
- কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, ইসলামবিদ্বেষী এবং ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান মুসলিমদের জন্য।
- যারা মুসলিম হয়েও ইসলামের পথ থেকে দূরে সরে আছেন ।

তাদের জন্য এই বইটি একটি সামান্য উপহার।

www.QuranerAlo.com

Contents

*** আমার কিছু আবেদন ***

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর। ইসলাম সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। কোন এক সময় আমার কাছে ইসলামের অনেক বিষয়ই সন্দেহযুক্ত মনে হত। অনেক প্রশ্ন জাগত মনে তার সবই উদ্ভট নাস্তিক টাইপের। আল-হামদুলিল্লাহ এখন আমি আমার সে সব বিষয়ের সন্দেহমুক্ত হয়েছি। সকল প্রশ্নের উত্তর আমি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে খুজে পেয়েছি। আমি লক্ষ্য করলাম সমাজের ভিতরে শুধু অমুসলিমরা নয় এমনকি মুসলিমরাও ইসলামের কোন কোন ব্যাপারে অনেক সন্দিহান (সংশয়যুক্ত)। আর সে সমস্ত সন্দেহ দূর করতেই বিভিন্ন গবেষকদের বই থেকে এই বইটি সংকলন করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। যাতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি দূর হয়ে যায়। ইসলাম সম্পর্কে অনেকেই মনের গহীনে অনেক প্রশ্ন লুকিয়ে রাখেন।

আর সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়েই আমার এই সংকলন। আপনি প্রশ্নগুলো মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখবেন না ! আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে তাহলেই উত্তর মিলবে নতুবা, না। আপনাকে কোন বিজ্ঞ মানুষকে প্রশ্ন করতে হবে। অথবা আপনি যে ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান বা যাচাই বাচাই করতে চান, যে ঐ ধর্মটি আসলে সঠিক কিনা ? তাহলে আপনাকে সেই দ্বীনের (ধর্মের) মূল গ্রন্থসমূহ (কিতাবসমূহ) পড়তে হবে। তাহলেই সেই (দ্বীন) ধর্ম সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন।

মুসলিম-অমুসলিম, নাস্তিক নির্বিশেষ সকল ধর্মের মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই ছোট বইটির সংকলন। তাই একজন সচেতন ও যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মুসলিম-অমুসলিম,নাস্তিক নির্বিশেষে আপনি আপনার ভাই-বোন,আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ইমাম (খতিব) ,দাঈ,অফিসের কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য, এই **'বইটি বিনামূল্যে বিতরণের'** মাধ্যমে **আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন** করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। বইটি বিনামূল্যে বিতরণের প্রয়োজন মনে হলে সরাসরি আমার সাথে অথবা প্রকাশনীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন **মোবাইল নম্বরে** অথবা **ইমেইলে**। প্রয়োজনে **"কুরিয়ারের"** মাধ্যমে **'দেশ-বিদেশের'** যে কোন জায়গায় আপনার ঠিকানায় বই পাঠানোর ব্যবস্থা করব ইনশ-আল্লাহ। ইসলামের দাওয়াতের কাজের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরনের উদ্দেশ্যে বইটি সরবারহ পেতে চাইলে খরচ পড়বে প্রতি কপি ৫০ টাকা হিসেবে-- ২৫ কপির জন্য = ১২৫০ টাকা, ৫০ কপির জন্য = ২৫০০ টাকা, ১০০ কপির জন্য = ৫০০০ টাকা, ৫০০ কপির জন্য = ২৫,০০০ টাকা, ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! আসুন আমরা নবী-রাসূলগণের সেই তাওহীদি দাওয়াতী মিশনকে অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াতকে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করি । বই বিতরণে অংশগ্রহণ করলে এটাও আপনার-আমার জন্য একটা ছদক্বায়ে জারিয়াহরূপে গণ্য হবে। এর সওয়াব আপনার মৃত্যুর পরও জারি থাকবে– যতদিন মানুষ উপকৃত হবে এই বই পড়ে। তাই এই ক্ষণকালীন পৃথিবীতে আমাদের কিছু পদচিহ্ন রেখে যাওয়া উচিত। হয়ত পরকালে এটাই আপনার-আমার জন্য নাজাতের ওসিলা হতে পারে। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, সুতরাং ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। বইটি সম্পর্কে পাঠকের কোন পরামর্শ থাকলে বা কোন ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ। বইটি প্রকাশ করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিদান কেবল আরশের অধিপতিই দিতে পারেন; তিনিই উত্তম প্রতিদানদাতা। আল্লাহ ﷻ আমার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং এই নগণ্য বান্দার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল
gazimuhammadtanjil@gmail.com

www.QuranerAlo.com

সূচিপত্র

১. প্রথম অধ্যায়: স্রষ্টা ও ধর্ম............................০৮
২. অদেখা 'সৃস্টিকর্তা'............................০৮
৩. 'সৃস্টিকর্তা' কি আসলেই আছেন?............................১০
৪. 'সৃষ্টিকর্তাকে' কে সৃষ্টি করেছেন? ১২
৫. 'সৃস্টিকর্তা' কে? তার পরিচয় কি? ১২
৬. 'পরকাল' বলতে আসলেই কিছু আছে কি? ১৩
৭. কেনইবা ধর্ম পালন করব? কোন ধর্ম পালন করা উচিত?............................১৫
৮. কেন এতগুলো ধর্ম ? ১৮
৯. মানুষ কেন বিভিন্ন ধর্ম গ্রহন করেছে নির্দিষ্ট একটি ছাড়া?............................১৯
১০. আপনি কেন ইসলামের পথে আসবেন ? ২০
১১. দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে স্রষ্টার ধারনা............................২১
১২. সনাতন (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা............................২১
১৩. শিখ ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা............................২৪
১৪. জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা............................২৪
১৫. ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা............................২৫
১৬. খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা............................২৬
১৭. ইসলামে স্রষ্টার ধারনা............................২৮
১৮. তৃতীয় অধ্যায়: প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভবিষৎবাণী............................৩৭
১৯. সনাতন (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ ৩৮
২০. জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ ৪১
২১. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ ৪২
২২. ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ ৪৪
২৩. সব ধর্মই ভাল কথা বলে তবে কেন ইসলাম? ৪৯
২৪. আপনি কেন কাফির (অবিশ্বাসী) অথবা মুসলিম? ৫১
২৫. চতুর্থ অধ্যায়: আসুন ইসলাম সম্পর্কে জানি............................৫২
২৬. ইসলাম কি কোন নতুন দ্বীন (ধর্ম)? ৫২
২৭. ইসলাম কি? ইসলামে কি আছে ? ৫৩
২৮. ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কি কি? মুসলিম কে? মুশরিক কে? কাফির কে? ৫৪
২৯. ঈমান কি?............................৫৫
৩০. কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায়? ৫৬
৩১. ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ)............................৫৯
৩২. তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক !............................৬০
৩৩. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক !............................৬১
৩৪. ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ ৬৩

৩৫. **পঞ্চম অধ্যায়: আসুন কুরআন সম্পর্কে জানি** ৬৬
৩৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী? ৬৭
৩৭. কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ !..৭১
৩৮. কুরআনের মত মহাপবিত্র গ্রন্থ লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার দুটি বাস্তব ঘটনা........৭২
৩৯. কুরআনের আসলত্ব! কিভাবে তা লেখা হয়? ৭৪
৪০. কুরআনের সংরক্ষণকারী সয়ং আল্লাহ..৭৬
৪১. কুরআন সম্পর্কে কুরআন কি বলে? ৭৬
৪২. কুরআনেই রয়েছে প্রকৃত বিজ্ঞানের ভান্ডার!..৭৭
৪৩. কুরআন ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে সেই ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর সমাধান কি? ৮৫
৪৪. **ষষ্ঠ অধ্যায়: আসুন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে জানি**....................................৮৬
৪৫. মুহাম্মাদ ﷺ কে সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে.............................৮৬
৪৬. সকল শ্রেণীর মানুষের একমাত্র আদর্শ সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ...........................৮৭
৪৭. মুহাম্মাদ ﷺ তিনিই সর্বশেষ (চূড়ান্ত) নবী ও রাসূল....................................৯৩
৪৮. কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) চোখে নবী মুহাম্মাদ ﷺ....................................৯৩
৪৯. নবীজির ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ..৯৪
৫০. **সপ্তম অধ্যায়: কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি ইসলামের নীতি**........................৯৬
৫১. কাফির (অবিশ্বাসী) মাতা-পিতার প্রতি আচরণ..৯৭
৫২. সকল শ্রেনীর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম! ৯৮
৫৩. আপনি জানেন কি? রুহের জগতে সকল মানুষই আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল? ৯৯
৫৪. পরকালের মুক্তির জন্য কি ইসলাম গ্রহনের প্রয়োজন আছে? ১০১
৫৫. **অষ্টম অধ্যায়: পথভোলা মানুষদের ইসলামে আসার সত্য ঘটনা** ১০২
৫৬. একজন নাস্তিকের ইসলামে ফিরে আসার বাস্তব কাহিনী.............................১০২
৫৭. একজন হিন্দুর ইসলামে ফিরে ফিরে আসার হৃদয়বিদারক কাহিনী.................১০৭
৫৮. আমার ইসলামে আসার গল্প..১১৪
৫৯. **নবম অধ্যায়: ইসলাম সম্পর্কে কিছু সংশয়মূলক প্রশ্নের উত্তর** ১১৬
৬০. **দশম অধ্যায়: আহবান ! কিসের আহবান?**..১২৭
৬১. কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি বার্তা ! ১৩২
৬২. কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর চিঠি! ১৩৯
৬৩. ইসলামের পথে চলার মজাই আলাদা!..১৩৯
৬৪. ইসলাম ছাড়া লাইফ ইমপসিবল ! ১৩৯
৬৫. সত্য আগত, মিথ্যা বিলুপ্ত, মিথ্যাতো বিলুপ্ত হওয়ারই জন্য.......................১৪০
৬৬. কবরে যে প্রশ্ন করা হবে ! ১৪১
৬৭. কিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্ন করা হবে !..১৪২
৬৮. সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবেন না, ফিরে আসুন ইসলামের পথে......................১৪৩
৬৯. **ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই ও ওয়েবসাইটের তালিকা:**.......১৪৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়ঃ স্রষ্টা ও ধর্ম

অদেখা 'সৃষ্টিকর্তা'

ভাই, আপনারা তো বলেন সৃষ্টিকর্তা বলে একজন আছেন। উনিই নাকি এই সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, দেখে শুনে রেখেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তো তার দেখা পেলাম না। যদি তিনি চান যে আমরা তাকে বিশ্বাস করি, তাহলে কি একবার দেখা দিলে হত না ? না দেখে কোন কিছু বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ? সৃষ্টিকর্তাকে দেখা যায় না, তার কথা শোনা যায় না- তাকে বিশ্বাস করা কি খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার না ?"

এরকম প্রশ্ন অনেক অবিশ্বাসীরাই করে থাকেন, বিশ্বাসীদের মনেও এরকম প্রশ্ন এসে যেতে পারে। আসলেই তো- স্রষ্টা তো চান আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁকে ভালবাসি, ভয় করি, আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি, তাঁর ওপর ভরসা রাখি, নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি- ইত্যাদি। কিন্তু তাঁকে তো দেখাই যায় না। না দেখে এতখানি বিশ্বাস রাখা কি অত্যন্ত অযৌক্তিক একটা ব্যাপার নয় ? চলুন বিষয়টা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি।

না দেখে বিশ্বাস বনাম প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসঃ

অনেকেই **"না দেখে বিশ্বাস"** আর **"কোন রকম প্রমাণ ছাড়া অন্ধ বিশ্বাস"** কে এক করে ফেলেন। দু'টোর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের অনেক ব্যাপারেই- না দেখে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে--আল্লাহর অস্তিত্ব তার মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কুরআনের (২) নং সূরা বাক্বারার একদম প্রথমেই মুত্তাকীদের (আল্লাহ ভীরু ও সৎকর্মশীলদের) সংজ্ঞা এভাবে এসেছে ঃ

"আলিফ-লাম-মীম।[১] এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ। যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে ।" [সূরা বাকারা ২ : ১-৩]

অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখাটা তাই ইসলামের এবং অধিকাংশ ধর্মেরই মৌলিক একটা নীতি। অন্যদিকে, ইসলাম কিন্তু মানুষকে প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করতে বলেনি। নবীজী ﷺ এর মক্কার জীবনী দেখুন- উনি কিন্তু মানুষকে যুক্তিতর্ক ফেলে চোখ-কান বুঁজে অন্ধভাবে মানতে বলেননি, বরং প্রায়ই তিনি মানুষকে যুক্তি দেখিয়েছেন, কারণ বুঝিয়েছেন, আবার কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অলৌকিক মুজিজা (নিদর্শন) দেখিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন।

---

১ এ অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। অন্য কেউ এগুলোর অর্থ জানে না । --তাফসীর ইবনে কাসীর পৃ: ১৩০ ।

www.QuranerAlo.com

১. নং পয়েন্ট ঃ ইসলাম না দেখে বিশ্বাস সমর্থন করলেও প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস সমর্থন করে না। কিন্তু ইসলাম যদি আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ দিয়েই থাকে, সেটা নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রমাণ নয়। এটা তো আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত না দেখেই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। তাহলে ?

উত্তরটা জানতে একটু বিজ্ঞানের কাছে ধর্ণা দেই- কারণ বর্তমান আধুনিক মানুষদের বিজ্ঞানের প্রতি ভরসা একটু বেশিই ।

দুনিয়ার কিছু গায়েব/অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস !

- আপনাকে ইলেকট্রিক তারে হাত দিতে বলা হলে হাত দিবেন ? না, আপনি কখনই হাত দিবেন না, কিন্তু তারের ভিতরের কারেন্ট তো দেখা যাচ্ছে না। গায়েব (অদৃশ্য) শক্তি, অথচ আপনি বিশ্বাস করছেন যে তারে হাত দিলেই আপনাকে ঝাকুনী দিয়ে ফেলে দিবে।
- জীবানু অদৃশ্য, খালি চোখে দেখা যায় না। অথচ ডাক্তারের কথায় আপনি না দেখেই বিশ্বাস করছেন । কিন্তু কেন ? অথচ আপনার সৃষ্টিকর্তার কথা না দেখে বিশ্বাস করতে পারবেন না ? (ব্যপারটা কেমন হয়ে গেল না ?)

২. নং পয়েন্ট ঃ "প্রমাণ" কথাটা বলতে এখানে শুধুমাত্র দার্শনিক বা যুক্তিতর্কের প্রমাণ বোঝানো হচ্ছে না। ইসলামের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে নবীজী ﷺ কয়েকটা জিনিস আমাদের দিয়ে গেছেন। মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী, তাঁর সময়কার মানুষের জন্য উনি বিভিন্ন অলৌকিক মুজিজা/নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, যেমন--চাঁদ দু'ভাগ করে ফেলা, যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় সামান্য একটু খাবার থেকেই পুরো সৈন্যদলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলা, ইত্যাদি। এগুলোর প্রভাব শুধুমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য, আমাদের জন্য অতটা নয়। সমগ্র মানবজাতির জন্য যে অলৌকিক নিদর্শনটা রয়েছে তা হচ্ছে কুর'আনের সাহিত্য। এর সমতুল্য কিছু তৈরি করা দুনিয়ার মানুষ অথবা জিনের পক্ষেও সম্ভব নয়, কাজেই এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহরই বাণী। যেমন আল্লাহ বলেন-- **"আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফিরদের জন্য।"** [সূরা বাকারা ২: ২৩-২৪]

অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুর'আন এবং হাদীছে আসা বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বাণী যেগুলো বর্তমানে সত্য প্রমাণিত হয়েছে---যেমন ফেরআউনের লাশ, যা সামনে আসছে, সে সমস্ত অসংখ্য প্রমাণগুলো "অদেখা সৃষ্টিকর্তাকে" না দেখে বিশ্বাস করতে সহায়তা করবে.. ইনশ-আল্লাহ..।

www.QuranerAlo.com

'সৃস্টিকর্তা' কি আসলেই আছেন ?

সৃস্টিকর্তা বলতে কেউ আছে কি নেই এ প্রশ্নের উত্তর আমরা এই কথোপকথনের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করতে পারি ।

এক মুসলিম ও এক নাস্তিকের (Atheist) সাথে আলাপ হচ্ছেঃ

- মুসলিম ঃ- আমাদের জগৎ (Universe) কি করে সৃস্টি হল?
- নাস্তিকঃ- "মহা-বিস্ফোরন" বা বিগব্যাং (Big Bang) এর মাধ্যমে (galaxy,sun,moon,world) মহাবিশ্ব,চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী সৃস্টি হয়েছে।
- মুসলিম ঃ- কতদিন আগে "মহা-বিস্ফোরন" (Big Bang) আবিস্কার হয়েছে?
- নাস্তিক ঃ- ৩০ থেকে ৪০ বছর আগে বিজ্ঞান (Science) "মহা-বিস্ফোরন" (Big Bang) আবিস্কার করেছে।
- মুসলিম ঃ- কিন্তু ভাই বিগব্যাঙ বা "মহা-বিস্ফোরন" (Big Bang) এর কথা পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা আছে যা বিজ্ঞান (Science) মাএ ৩০ থেকে ৪০ বছর আগে আবিস্কার করেছে।

  আল্লাহ বলছেন--**"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ আর যমীন এক সঙ্গে সংযুক্ত (মিশে)২ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম, আর প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?"** [সুরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৩০]
- মুসলিম ঃ- আচ্ছা চাঁদের কি নিজস্ব আলো আছে নাকি প্রতিফলিত (reflected) আলো?
- নাস্তিক ঃ- প্রথমে বিজ্ঞান (Science) মনে করতো চাঁদের নিজস্ব আলো আছে ,কিন্তু ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগে বিজ্ঞান (Science) আবিস্কার করেছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই চাঁদের আলো প্রতিফলিত (reflected)।
- মুসলিম ঃ- কিন্তু ভাই ১৪০০ বছর আগে কুরআনে এই কথা বলা আছে যা বিজ্ঞান (science) মাএ ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগে আবিস্কার করেছে।

  কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন- **"কতই না কল্যাণময় তিনি যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর আলো বিকিরণকারী চন্দ্র।"** [সুরা ফুরকান ২৫ ঃ ৬১]

এ আয়াতের আরবি শব্দ مُّنِيرً "মুনির" মানে Reflected Light বা (বিকিরণ) প্রতিফলিত আলো।

---

২ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আদিতে আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র ও পৃথিবী ইত্যাদি পৃথক সত্তায় ছিল না; বরং সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত (মিশে) ছিল। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি। পরবর্তীকালে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। এটিই বিগ ব্যাং (Big Bang) বা মহাবিস্ফোরণ থিওরী। সূত্র - আল-বয়ান ।

- মুসলিম ঃ - আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি এটা দেখতে কেমন?
- নাস্তিক ঃ- ভাই - এটা গোলাকার (কমলা লেবুর মত) ।
- মুসলিম ঃ - কতদিন আগে বিজ্ঞান (Science) এইটা আবিষ্কার করেছে?
- নাস্তিক ঃ- ১৫৯৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেইক এটা আবিষ্কার করেছে।
- মুসলিম ঃ - কিন্তু ভাই ১৪০০ বছর আগে কুরআনে এই কথা বলা আছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন **"আর আল্লাহ পৃথিবীকে এরপর ডিম্বাকৃতি করে তৈরী করেছেন ।"** [সুরা নাজিয়াত ৭৯ ঃ ৩০]

এই আয়াতের আরবি শব্দ "দাহাহা" دَحَاهَا যার অর্থ উট পাখির ডিম। একটি উট পাখির ডিমের আকৃতি হচ্ছে পৃথিবীর ভূগোলকীয় আকৃতির ন্যায়। এভাবেই কুরআন পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারনা দিয়েছে ।

কে ১৪০০ বছর আগে কুরআনে এই কথা উল্লেখ করেছেন ???

- মুসলিম ঃ- কতদিন আগে বিজ্ঞান (Science) আবিষ্কার করেছে সূর্য নিজ অক্ষের উপর ঘুরে?
- নাস্তিক ঃ- বিজ্ঞান (Science) এইটা আবিষ্কার ২০-৫০ বছর আগে।
- মুসলিম ঃ- কিন্তু ভাই ১৪০০ বছর আগে কুরআনে এই কথা বলা আছে । আল্লাহ কুরআনে বলছেন **"(আল্লাহই) সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"** [সুরা আম্বিয়া ২১ ঃ৩৩]
- মুসলিম ঃ- মিষ্টি ও লবনাক্ত পানি মিশে না । কিন্তু ১৪০০ বছর আগে কুরআনে কে এই কথা গুলো জানিয়েছে ? কুরআনে আল্লাহ বলছেন - **"তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।"** [সূরা ফুরকান -২৫ ঃ ৫৩]
- মুসলিম ঃ- পানি থেকে জীব সৃস্টি। কিন্তু ১৪০০ বছর আগে কুরআনে কে এই কথা গুলো জানিয়েছে? পবিত্র কুরআনের ২১ নং সুরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- **"প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা ? "**
- নাস্তিকঃ-! (নিরব ও চুপ)
- মুসলিম ঃ- আরও অনেক বৈজ্ঞানিক (Scientific) কথা বলা আছে ১০০০ আয়াতের মত। ১৪০০ বছর আগে কে এইগুলো কুরআনে বর্ণনা করেছে ? ১৪০০ বছর আগে কি বিজ্ঞান (Science) এত উন্নত ছিল ? আর বর্তমানে বড় বড় বিজ্ঞানীরাও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে । (Science) বিজ্ঞান হচ্ছে সৃস্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে নতুন কিছুতে রূপান্তর করা, কিন্তু এই বিজ্ঞানের সৃস্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ। যিনি মহাবিজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

অতএব ধরে নিতেই হবে যে একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। যিনি সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন ।

www.QuranerAlo.com

'সৃষ্টিকর্তাকে' কে সৃষ্টি করেছেন ?

আসলে প্রশ্নটিই সঠিক নয়। কেননা এখানে বলা হয়েছে **"সৃষ্টিকর্তাকে"** কে সৃষ্টি করেছেন?

যিনি "সৃষ্টিকর্তা" তাকে আবার সৃষ্টি করা লাগে নাকি? তিনিইতো সকলের স্রষ্টা। ধরুন----আপনাকে বললাম- সৃষ্টিকর্তাকে অমুক সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। **আপনিতো দ্বিতীয়বারঃ** প্রশ্ন করবেন তাকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমি আবার বললাম, তাকে অমুক সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। **আপনি** আবারও প্রশ্ন করবেন তাকে কে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর কোনদিনই শেষ হবে না। "স্রষ্টা ছাড়া যদি কিছু সৃষ্টি না হয়। তাহলে স্রষ্টা ছাড়া সৃস্টিকর্তার নিজের সৃষ্টি কিভাবে হল ?" ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম "ক" নামকবস্তু সৃস্টিকর্তাকে সৃষ্টি করেছে। তবে, এবার বলুন তো এই "ক" কে কে সৃষ্টি করেছে?

আসুন আর একটি উদাহরণ দেই---

ধরুন একজন মানুষ একটি ছবি এঁকেছেন। যে মানুষটা ছবি একেছেন তার নাম ধরুন **'আবদুল্লাহ'**। এখন আপনাকে একজন প্রশ্ন করল: ছবিটা কে একেঁছে? আপনার উত্তর হবে নিশ্চয়ই - **'আবদুল্লাহ'** । এখন আবার যদি লোকটা প্রশ্ন করে ' **'আবদুল্লাহ'কে'** কে একেঁছে? আপনার কাছে কি কোন উত্তর আছে? না, নেই। প্রশ্নটা ঠিক হয় নি। সাগরিকার ক্ষেত্রে আকাঁনো প্রশ্ন টা আসে না।

'আবদুল্লাহ'র ক্ষেত্রে প্রশ্নটা করতে হবে এভাবে ঃ- **'আবদুল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ?** এবার উত্তরটা কি হবে। নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। এখন যদি প্রশ্ন করেন সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন প্রশ্নটা কি **'আবদুল্লাহ'কে কে একেঁছে ?"**এ রকম হয়ে গেল না ? অর্থাৎ দেখতে হবে প্রশ্নটি আসলে প্রশ্ন হওয়ারই যোগ্যতা আছে কি না । অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা প্রযোজ্য নয়। আর যে প্রশ্নটাই ভুল তার তো আর উত্তর পাওয়া যাওয়া সম্ভব না।

www.QuranerAlo.com

'সৃস্টিকর্তা' কে ? তার পরিচয় কি?

এই মহাবিশ্ব, পৃথিবী, মানুষ এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু যিনি সৃস্টি করেছেন তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ে একটি কবিতা

মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ে একটি কবিতা

এমন সুন্দর সৃষ্টি যাঁর তাঁর পরিচয় শোন
তাঁর সৃষ্টির নৈপুণ্যের মাঝে ত্রুটি নেই কোন।
ঐ যে দূরে নীলাভ আকাশ দাঁড়িয়ে খুটি ছাড়া
তাতে খচিত চন্দ্র-সূর্য অসংখ্য গ্রহ-তারা।
অবনি মাঝে হেথায় হেথায় গগণ ছোঁয়া পাহাড়
তাথেকে কোথাও সুদৃশ্য ঝর্ণা প্রবাহিত হয় আবার।
হরেক রকম বৃক্ষে ধরে নানান সাধের ফল
খাইলে পরে দেহের মাঝে বাড়ে শক্তি-বল।
পাখ-পাখালীর কণ্ঠে শুনি মিষ্টি-মধুর গান
তাদের কলরবে খুশীর দোলায় ভরে যায় প্রাণ।
গুলশানে ফোঁটে সুরভিত রঙ্গীন ফুল
গুণগুণ গানে মধু আহরণে যায় ছুটে অলিকুল।
কার ইঙ্গিতে তৈরী এমন বিশাল অথৈয় পাথার
জলজ প্রাণী সহ তাতে রয়েছে বিবিধ আহার।
নিপুণ হাতে রিযিক বানায় কোন সে কারিগর?
জোয়ার-ভাটা দিবস-যামী কার এই চরাচর?
সমস্ত সৃষ্টির মালিক যিনি তিনিই আল্লাহ তা'আলা
হায়াত-মওত সবই তাঁর যায় কি তাকে ভোলা?
তিনি কাউকে জন্ম দেননি জন্মদাতা নাই তাঁর
অংশীদার স্থাপন করিও না ইবাদতে তাঁর।
ধরার বুকে সৃষ্টি বিষয়ে ভাবো যদি ভাই
তবেই তাঁকে যথার্থ চিনবে সন্দেহ এতে নাই।[৩]

'পরকাল' বলতে আসলেই কিছু আছে কি?

পরকাল বলতে কিছু আছে কি নেই এ সম্পর্কে আমরা সুন্দর একটা কাল্পনিক কথোপকথন পড়ব ।

একটি মাতৃগর্ভে জমজ দুই শিশুর মধ্যে কথা হচ্ছে এরকম তাদের-

- **প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলো ঃ-** তুমি কি প্রসব-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করো?

---

৩ লেখক- হাফেয আব্দুস সালাম ,নারচি, নওগাঁ।

- **দ্বিতীয়জন বললো ঃ-** হ্যা, অবশ্যই বিশ্বাস করি। নিশ্চয় প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছু আছে। হয়তো প্রসব পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির জন্যই আজ আমরা এখানে।
- **প্রথমজন বললো ঃ-** আরে বোকা! প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছুই নেই। তোমার সেই কাল্পনিক জগত কেমন হতে পারে বলতো দেখি?++
- **দ্বিতীয়জন বললো ঃ-** আমি ঠিক জানিনা। তবে হতে পারে সেখানে এখানের (মাতৃগর্ভের) তুলনায় আলো অনেক বেশি হবে। হতে পারে সেখানে আমরা আমাদের পা দিয়ে হাঁটতে পারবো। আমাদের মুখ দিয়ে নিজেরাই খাদ্য গ্রহন করতে পারবো। হয়তো সেই জগতে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় থাকবে যা আমরা এখন কল্পনা করতে পারছিনা।
- **প্রথমজন বললো ঃ-** এটা নিছক (অবাস্তব) কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। পা দিয়ে হাঁটাহাঁটি ? অসম্ভব। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহন ? অলিক কল্পনা। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টি আসে এই নাড়ির মাধ্যমে। কিন্তু নাড়ির এই স্বল্প দৈর্ঘ্য কখনোই প্রসব পরবর্তী জীবনের পক্ষে যুক্তি হতে পারেনা। প্রসব পরবর্তী জীবন বলতে আসলে কিছু নেই। এটা (অবাস্তব) কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।
- **দ্বিতীয়জন বললো ঃ-** আমি মনে করি প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছু আছে এবং সেটা এই মাতৃগর্ভের জীবনের চেয়ে ভিন্ন। হতে পারে সেখানে বাঁচার জন্যে আমাদের এই নাড়ির দরকার হবে না।
- **প্রথমজন উত্তর দিলো ঃ-** আরে গাধা ! প্রসব পরবর্তী জীবন বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেই জীবন থেকে কখনো কেউ এই জীবনে ফিরে আসেনা কেনো ? আসলে প্রসবের পরের জীবন বলতে কিছুই নেই। প্রসব হচ্ছে জীবনের শেষ। এরপর আর কিছু নেই। আছে কেবল অন্ধকার আর শুন্যতা।
- **দ্বিতীয়জন বললো ঃ-** আমি ঠিক জানিনা। সে আরো বললো,- "হতে পারে সে জগতে আমাদের সাথে আমাদের মায়ের দেখা হবে। মা হয়তো সে জগতে আমাদের দেখাশুনা করবেন।"
- **প্রথমজন হাসতে লাগলো, আর বললো ঃ-** মা! তুমি 'মা' তে বিশ্বাস করো ? এটা সত্যিই হাস্যকর ! যদি মা বলে কেউ থেকে থাকে, তাহলে সে এখন কোথায় ?
- **দ্বিতীয়জন বললো ঃ-** "সে আমাদের কাছেই আছেন তার পেটেইতো আমরা বেঁচে আছি। তাকে ছাড়া আমাদের এই জগত অসম্ভব।"
- **প্রথমজন বললো ঃ-** যেহেতু আমরা মা বলে কাউকে দেখিনা, অনুভব করিনা। সুতরাং, এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা এই যে, আসলে মা বলে কেউ নেই।
- **দ্বিতীয়জন মুচকি হেসে বললো ঃ-** মাঝে মাঝে যখন তুমি নীরব থাকো, তখন মনোযোগ সহকারে যদি খেয়াল করো তাহলে তুমি তার উপস্থিতি টের পাবে। তুমি তার কণ্ঠ শুনতে পাবে। বুঝতে পারবে তিনি তার দরদভরা মধুর কণ্ঠে উপর থেকে আমাদের ডাকছেন।

www.QuranerAlo.com

- **পরে যখন উভয় শিশুই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীতে আসলো তখন তাদের প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বলল** ঃ- সত্যিইতো তুমি যা বলছ তাতো আমি এখন সত্যই দেখতে পাচ্ছি এবং এখন তার প্রমাণ পেয়েছি বরং আমার ধারণা (বিশ্বাস) ভূল ছিল ।

ঠিক পরকালের ব্যাপারটাও প্রায় একই রকম যখন কেউ পরকালের পথে যাত্রা করবে তখন সে ঠিকই তা সত্য দেখতে পাবে। দুনিয়াতে পরকালকে অবিশ্বাস করলেও। কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না। বড় দেরি হয়ে যাবে কারণ সে না দেখে বিশ্বাস করেনি।[৪]

উপরোক্ত কথোপকথন থেকে আমাদের মধ্যে হয়ত পরকালের সম্পর্কে অস্তিত্ব জাগ্রত হয়েছে। আর যদি না হয় তাহলে হয়ত আমাদের ভিতরে চিন্তাশক্তির বিবেকবোধের বিকাশ ঘটেনি।

কেনইবা ধর্ম পালন করব? কোন ধর্ম পালন করা উচিত?

আসলে ধর্ম কি? কেন পালন করব? না করলে কি হবে? আসলেই কি জাহান্নাম (নরক) আছে? ধর্ম মানলে কি জান্নাত (স্বর্গ)পাব ? তাহলে কোন ধর্ম পালন করব? এ ধরনের কিছু প্রশ্ন অনেকেরই মনের গভীরে থাকে। এগুলো এক সময় আমার কাছেও অনেক জটিল বিষয় ছিল কিন্তু এখন জানার পর এগুলা হয়ে গেল যেন খুবই সাধারণ বিষয়। ধর্ম হল সৃষ্টিকর্তার দেয়া একটা জীবন-বিধান যেটা মেনে চলতে বলা হয়েছে এবং বিধানটি ঠিক ভাবে মানার জন্য পুরুষ্কারেরও ব্যবস্থা আছে, আর না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন-ধরুন আমরা পরীক্ষা দেই স্যাররা প্রশ্ন করে এবং সব গুলার জন্য নম্বর থাকে এবং পাশ করার জন্যও একটা নির্দিষ্ট নম্বর থাকে। আবার স্যাররা আমাদের সিলেবাসও দিয়ে দেয় এতটুকু পড়তে হবে এবং এইভাবে উত্তর করতে হবে এবং আমাদের পরীক্ষার জন্য সকল নিয়মকানুন বলে দেন তারপর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি আমরা কেউ পাশ করি কেউ ফেল করি কেউ A+ পাই । এই রকমই তো, তাই না? ধর্ম আসলে ৯০% এরকম একটা জিনিস। সৃস্টিকর্তা আমাদেরকে জীবন-বিধান দিয়ে দিয়েছেন এবং কিভাবে উত্তর করতে হবে তা সিলেবাস (কিতাব) দিয়ে দিয়েছেন এবং পাস নম্বর, A+ নম্বর সব বলে দিয়েছেন, দূতগণকে (নবী-রাসুলগণ) শিক্ষকরূপে দিয়েছেন । আমাদের এই ভাবে পরীক্ষা দিতে হবে তারপর পাশ, A+ যেটাই হোক অর্জন করতে হবে। যে কেউ চাইলে কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নাও করতে পারেন, (যাকে নাস্তিক বলে আর কি !) সেই স্বাধীনতাও আছে। সাধারণত আমরা পরীক্ষা না দিলে কি হয় এখানেও

৪ মূলঃ Dr. Wayne Dyer এর লেখা Your Sacred Self বই এর একটি কাল্পনিক কথোপকথন থেকে নেয়া -- সংযোজিত ও সম্পাদিত ।

www.QuranerAlo.com

তাই হবে আর কিছু না "ফেল" (শাস্তিস্বরূপ জাহান্নাম/নরক)। আচ্ছা আমরা সাধারণত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলো কেন দেই ? স্যাররা কি জোর করে আমাদের নাম রেজিস্ট্রি করে আমাদের পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন ? অবশ্যই না। আমরা স্বেচ্ছায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আল্লাহ্'র পরীক্ষাটিও তেমন- আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠানোর আগে রুহের জগতে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেছিলেন--তা কুরআনের ৭ নং সুরা আল-আরাফ-এর ১৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

- **"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।'** (এটা এজন্য করা হয়েছিল) **যাতে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'।"**

এ আয়াতে আল্লাহ আমাদের রুহের (আত্মার) জগতে জিজ্ঞেস করেছিলেন-**'আমি কি তোমাদের রব** (প্রতিপালক) **নই?"** তখন আমরা সবাই (পৃথিবীর সকল মানুষ) উত্তর দিয়েছিলাম- **"হ্যা আপনিই আমাদের রব** (প্রতিপালক) **এবং আমরা এ ব্যাপার সাক্ষ্য দিচ্ছি।"** এরপর আল্লাহ বললেন-"(এটা এজন্য করা হয়েছিল) **যাতে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না'।**

দেখুন এভাবে আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং এই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েও দিয়েছেন---পরীক্ষা করার জন্য কে আল্লাহকে মান্য করে? আর কে অমান্য করে? তাই বলা যায়, সম্পূর্ণ পৃথিবীটাই একটা পরীক্ষাকেন্দ্র এবং এখানে আমাদের বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা নেয়া হবে যেমন- কাউকে গরীব, কাউকে ধনী ,কাউকে সবল কাউকে দুর্বল বানানো হবে।

পবিত্র কুরআনের (৩) নং সুরা আল-ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে- **"অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ"।**

এই হল ধর্ম এবং উপরোক্ত কারণে সবাইকে অবশ্যই কোন না কোন ধর্মের অনুসারী হতে হবে (নাস্তিক হওয়া চলবে না, যদি পরীক্ষায় পাশ করতে চান!) এখন প্রসঙ্গ হল যে, "কোন ধর্ম পালন করব ?" ও আল্লাহ্! এটা তো হল দুনিয়াতে মারামারি লাগিয়ে দেয়ার মত প্রসঙ্গ!

কোন মুসলিম পন্ডিতকে অন্য ধর্ম ঠিক এটা বলে বোঝানো সম্ভব না, হিন্দু পন্ডিতকেও না, খ্রিষ্টানদের গীর্জার ফাদারের মতে যিশু, সৃষ্টিকর্তা এবং পবিত্র আত্মা এই তিনেই (ট্রিনিটিতে) সব কিছুর মূল। আবার তারা যিশুকে গড বলেও মানে যাই হোক, তাহলে এখন করব কি? সমাধান কি? উত্তর কি? সবাইকে কি এক করা যাবে ? উত্তর হল- হ্যা **"এক করা যাবে"** সবাই চাইলেই এক করা যাবে পৃথিবীতে শান্তি

প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এক করার আগে ছোট্ট করে বলে নেই কেন এক করা এত জরুরি ? সবাই যে ধর্মে আছে সেটা পালন করলেই তো হয়? আবার সবাইকে একটি নিয়মের মধ্যে আনা কি দরকার ? সবাইকে একটি নিয়মের মধ্যে আনার অনেক দরকার আছে, যেমন পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ মানুষই চিন্তা করে যে, সব ধর্মই ভাল ভাল কথা বলে তাহলে যে কোন ধর্ম পালন করলেই হয়, তাই না ? আসলে ব্যপারটা তাই। পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন। অসংখ্য কিতাব পাঠিয়েছেন আল্লাহ। এর মধ্যে ৪ খানা প্রসিদ্ধ যেমন-১.তাওরাত- মুসা عليه السلام-এর উপর নাযিল হয় ২.যাবুর-দাউদ عليه السلام-এর উপর নাজিল হয় ৩.ইনজীল- ঈসা عليه السلام-এর উপর নাযিল হয় ৪.কুরআন- মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাজিল হয় ।

এই সব কিতাবই এসেছে আল্লাহ্'র কাছ থেকে । তাহলে একটা পালন করলেই তো হয় তাই? আসলে কি তাই? কিন্তু একমাত্র "পবিত্র আল-কুরআন" ব্যতিত পৃথিবীতে আর একটি কিতাবই এখন বিশুদ্ধ (নির্ভূল) রূপে নেই চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি! তাহলে কিভাবে বলা যায় যে, যে কোন একটি পালন করলেই হয় ? সুতরাং আমাদের উচিত এই বিশুদ্ধ টাই মেনে চলা এবং কিছু প্রধান বিশুদ্ধ কিতাব যে বিশুদ্ধ না এটার একটা প্রমান হল যে, "বাইবেল" এ "রেড লেটার" নামে একটা ভার্সন পাওয়া যায় এবং ঐ রেড লেটারের কথা গুলো শুধুমাত্র যিশু (ঈসা عليه السلام) নিজে বলেছেন এবং সেই কথাগুলোর পরিমাণ হল ৫% আর বাকি সব কাদের লিখা ? কাদের? উত্তর হল বাকি সব লিখেছেন বিভিন্ন খ্রীষ্টান পন্ডিতগণ (আলেমগণ) যেমন ঃ পিটার, জন ইত্যাদি খ্রীষ্টান পন্ডিতগণ এবং খ্রীষ্টান ধর্মে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে যুগের তালে তালে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন লাইন সংশোধন/পরিবর্তনও করা হয়। এরকম ভাবে প্রায় সকল কিতাবই এখন অবিশুদ্ধ অবস্থায় আছে একমাত্র পবিত্র আল-কুরআন ব্যতিত। আমি এখানে খ্রীষ্টান ধর্মের কথা বলেছি কারণ, বর্তমানে খ্রীষ্টান ধর্ম সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি।

সবাই নিশ্চয় ভাবছেন আমি এখন বলব যে, সবাই আস্তে আস্তে ইসলাম জানেন এবং এই ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করেন তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে । এটা ভাবলে কিছুটা ভুল ভেবেছেন। আমি বলতে চাই কাউকে কারও ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে না, সবাই যে ধর্মের অনুসারী সেটাই পালন করেন কিন্তু! এখানে একটা ছোট কিন্তু আছে ! সেটা একটু কষ্ট করে খেয়াল করলেই হয়ে যাবে, আর সেটা হল–

আল্লাহ্ পবিত্র আল- কুরআনে (৩) নং সুরা আল-ইমরান, ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন যে ঃ **"বল, 'হে আহলে কিতাব! <u>এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই</u>, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো 'ইবাদাত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ**

কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পনকারী)।"৫

কিন্তুটা হল - উপরের আন্ডার লাইনের লেখা লাইনটি, সবাইকে এখন এক দিকে আসতে হবে আর তা কিভাবে?- তা হল যে, সকল ধর্মের কিতাবে যে মিল গুলো আছে সেগুলো মেনে চলা, মিল গুলো ব্যতীত বাকি সব গুলা আমরা পরে দেখব। আগে মিল গুলো মানব, তারপর অমিলগুলো পরে দেখা যাবে। যেমনঃ হিন্দু ধর্মে *"মুর্তি পুজা (নিষিদ্ধ) হারাম"* [যযুর্বেদ অধ্যায়-৩,অনুচ্ছেদ-৩২] আরও বলা হয়েছে যে, *'তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া"*। [Chandgya উপনিষদ ৬: ২: ১]খ্রীষ্টান ধর্মে বলা আছে শুকর হারাম, মদ হারাম ইত্যাদি। এই সব জিনিস গুলো ইসলাম ধর্মেও হারাম; কিন্তু অন্য ধর্মের কেউ এটা মানতে রাজি নয় কারণ তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, এটাই প্রধান সমস্যা।

কেন এতগুলো ধর্ম?

আল্লাহ যদি এক ও অদ্বিতীয় হয়ে থাকেন তবে এতগুলো ধর্ম অস্তিত্বে আসার কারণ কী? দ্বীন (ধর্মের) উৎস আল্লাহ তা'আলা। অতঃপর মানুষ নিজের ইচ্ছামত আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনে (ধর্মে), ধর্মীয় বিধানাবলিতে সংযোজন-বিয়োজন (সংশোধন) আরম্ভ করে দেয়, উদ্দেশ্য-একে অন্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় নতুন ধর্মের।

আল্লাহ মুসলিমদেরকে সতর্ক করেছেন তারা যেন তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই ফাঁদে পা না দেয়, যারা পরস্পরে মতভেদ করে বিভিন্ন ধর্মীয়-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ বলেছেন--

- **"তোমরা সেই লোকদের মত হয়ে যেয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌঁছার পরে বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করেছে এবং এ শ্রেণীর লোকেদের জন্য আছে মহা শাস্তি। সে দিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখ কালো হবে, যাদের মুখ কালো হবে,** (তাদেরকে বলা হবে), **তোমরা কি ঈমান আনার পরও কুফরী করেছিলে ? কাজেই নিজেদের কুফরীর জন্য শাস্তি ভোগ করতে থাক।"**

  [সূরা আল ইমরান : ৩: ১০৫-১০৬]

পূর্বের মানুষেরা ওহীর ব্যাপারে নানা প্রকার মিথ্যা ছড়িয়েছে, তারা পবিত্র গ্রন্থসমূহ নিজ হাতে পরিবর্তন (সংযোজন-বিয়োজন) করেছে, তারা নবীদেরকে নির্যাতন করেছে, এমনকী হত্যা পর্যন্ত করেছে যেমন--ইহুদিরা। ফলে তৈরি হয়েছে নতুন ধর্ম, নতুন মতবাদ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

---

৫ মুসলিম মানে - এক আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পনকারী/আনুগত্যকারী।

- "এদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা তাকে কিতাবের অংশ বলে মনে কর, মূলতঃ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ, বস্তুতঃ তা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ নয়, তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে মানবমন্ডলীর মধ্যে বলে - তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং বলবেঃ রবের ইবাদাতকারী হও - কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা দান কর এবং ওটা পাঠ করে থাক। [সূরা আল ইমরান : ৩ : ৭৮-৭৯]

মানুষ কেন বিভিন্ন ধর্ম গ্রহন করেছে নির্দিষ্ট একটি ছাড়া ?

আসুন এই প্রশ্নের উত্তর একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে বুঝার চেষ্টা করি। নবী নূহ عليه السلام এর সম্প্রদায় (গোত্র) তাওহীদপন্থী (একেশ্বরবাদী) ছিল। তারা এককভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করত। তাঁর সাথে কাউকে শরিক (অংশীদার) করত না। সে সময় পৃথিবীর বুকে কোন শিরক ছিল না। তাদের মধ্যে ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসর নামে পাঁচজন "আল্লাহ-ওয়ালা" নেককার লোক ছিল। তাদের মৃত্যুর পর তার কাওমের (গোত্রের) লোকেরা খুবই চিন্তিত হলো। তারা বলল, যারা আমাদেরকে ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত তারাতো চলে গেলেন। শয়তান এসে তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, তোমরা যদি তাদের ছবি তৈরি করতে মূর্তির আকৃতিতে আর তা মসজিদের কাছে রেখে দিতে তাদেরকে দেখলেই তোমরা তোমাদের ইবাদাতে প্রাণ ফিরে পাবে। লোকেরা শয়তানের কথা শুনল এবং মূর্তি তৈরি করল। উদ্দেশ্য তাদের দেখে ইবাদাত ও নেক কাজে স্পৃহা ও উদ্দীপনা লাভ করা। এভাবে কিছুকাল পার হয়ে গেল। তাদের এ প্রজন্ম বিদায় নিল। নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ তাদের সন্তানগণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তারা দেখে তাদের বাপ দাদারা এ সমস্ত মূর্তি সম্পর্কে ভাল ভাল কথা তাদেরকে স্মরণ করায়। তাদের পর আর এক প্রজন্ম দুনিয়ায় এলো। ইবলিস তাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের আগে যারা ছিল তোমাদের বাপ-দাদারা এগুলোর ইবাদাত করত! দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি বা বিপদ আপদে তারা এগুলোর আশ্রয় কামনা করত। সুতরাং তোমরা এগুলোর ইবাদাত করো। তারা শয়তানের প্ররোচনায় নেক বান্দাদের মূর্তির ইবাদাত শুরু করল। (আর এভাবেই এই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার শুরু হয় তথা শিরকের সূচনা ঘটে, এবং আবির্ভাব হয় নতুন মূর্তিপূজার ধর্ম তথা শিরকের ধর্ম) তখন আল্লাহ ﷻ তাওহীদের (আল্লাহর এককত্বের) মিশন দিয়ে নূহ عليه السلام- কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ঐ সমস্ত নেককার বান্দাদের মূর্তি (প্রতিমার) সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহবান জানালেন। সাড়ে নয়শ বছর তিনি দাওয়াত

দিলেন। কিন্তু মাত্র অল্প ক'জন লোক দাওয়াত কবুল করল। মুশরিক জাতির নেতৃস্থানীয়রা তখন বলেছিল– **"আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেবদেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুআ'কে, আর না 'ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাসরকে।"** [সূরা নূহ ৭১ : ২৩]

নূহ ﵇ তার জাতিকে শুধুমাত্র এক ইলাহের (তথা আল্লাহর) ইবাদাতের দিকে আহবান করেছিলেন। তিনি তাদের কোন পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেননি। অথচ তার জাতি প্রত্যুত্তরে পাঁচজন আল্লাহ-ওয়ালার নাম উল্লেখ করে বলতে চাইল–"হে নূহ! এরা কি তোমার চেয়ে কম বুঝেছিল নাকি?" বতর্মানেও জাতির সামনে তাওহীদের (এক আল্লাহর ইবাদাতের) দাওয়াত তুলে ধরা হলে তারা বিভিন্ন পীর-পুরোহীতদের,বাপ-দাদা,পূর্বপুরুষের কথা উল্লেখ করে বলে এরা কি কম বুঝে?। তারা কি ভূল করেছিল নাকি?

ঠিক এই ঘটনার মতই এভাবেই সৃষ্টি হয় শিরকের নতুন ধর্ম । তখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় । কেউ সঠিক ধর্মের পথে থাকে যা আল্লাহ প্রদত্ত আর অন্যরা বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে, যা শয়তান ও তার অনুসারীরা তৈরি করে।

আপনি কেন ইসলামের পথে আসবেন?

আপনি হয়ত বলবেন যে, আমাদেরকে আহবান করলেন আর আমরা মুসলিম হয়ে গেলাম। আমরা কেন ইসলামের গ্রহণ করব ? যেখানে পৃথিবীতে আরও দ্বীন (ধর্ম) রয়েছে আমি সেগুলোর অনুসরন করব। হ্যাঁ, অবশ্যই! আমিও আপনার সাথে একমত, ঠিক আছে ভাই আপনি প্রত্যেকটি ধর্মের মূল গ্রন্থসমূহ নিয়ে পড়াশোনা করুন তারপর যাচাই-বাচাই করুন কোন ধর্মটি সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত ? তারপর যেটা সঠিক ও বিজ্ঞান/যুক্তিসম্মত পাবেন উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সেটার অনুসরণ করবেন। আপনি যদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে দেখবেন আসলে কোন ধর্মই পরিপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত নয় একমাত্র ইসলাম ছাড়া। হ্যাঁ, এটাই সঠিক যদি আপনি বুঝতে এবং যাচাই করতে পারেন। তো আজকেই শুরু করে দিন অনুসন্ধান, তার যাচাই-বাছাই ও গবেষণা। আসুন আমরা জানি পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা,ইসলাম, মুসলিম, মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা এবং শেষ-নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমনের ভবিষ্যত-বাণী সমুহ দলিলসহ (রেফারেন্সসহ) উল্লেখ করব ইনশ-আল্লাহ।৬

৬ মূল: *"বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা"* বই এর পৃ: ১৩। - লেখক-ডা: জাকির নায়েক- পিস পাবলিকেশন্স এবং *"প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারণা"*- বই এর পৃ: ১১ থেকে ৪৪ এর সার সংক্ষেপ । লেখক- ডা: জাকির নায়েক- তাওহীদ পাবলিকেশন্স । বিস্তারিত আরও জানতে ডা: জাকির নায়েকের ভিডিও লেকচার দেখুন ও বই পড়ুন । ভিডিও লেকচার "বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা" Concept of God in major Religion- ডা: জাকির নায়েক।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ
প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে স্রষ্টার ধারনা

পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারণা নিম্নরূপ ঃ

১. সনাতন (হিন্দু) ধর্মে স্রষ্টার ধারনা।
২. শিখ ধর্মে স্রষ্টার ধারনা।
৩. জরুথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মে স্রষ্টার ধারনা।
৪. ইয়াহুদি ধর্মে স্রষ্টার ধারনা।
৫. খ্রিষ্টান ধর্মে স্রষ্টার ধারনা।
৬. ইসলামে স্রষ্টার ধারনা।

সনাতন (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা

আসুন আমরা সনাতন (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা সম্পর্কে জানি। হিন্দুধর্মকে সাধারণতভাবে বহু-দেবতার (স্রষ্টার) ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি কোনো সাধারন হিন্দু কে প্রশ্ন করি আপনি কতজন দেবতায় (স্রষ্টায়) বিশ্বাস করেন ? কেউ হইতো বলবে ৩ জন, কেউ বলবে ৩০ জন, কেউ বলবে ১০০ জন আবার কেউ হয়তো বলবে তিন শত ৩৩ কোটি জন। কিন্তু আমরা যদি কোনো জ্ঞানী, পন্ডিত যিনি হিন্দু ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ গুলো যেমন; বেদ, পূরান, উপনিষদ পড়েছেন তার কাছে যাই তাহলে তিনি বলবেন- "হিন্দুদের কেবল মাত্র একজন দেবতার (স্রষ্টার) উপাসনা (ইবাদত) করা উচিত।"

হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ঈশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধিতে ঃ

- সাধারণভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদ তথা- সবকিছুতে ঈশ্বর (স্রষ্টা) মিশে আছেন- এবং প্রাকৃতিক সকল বস্তু, বৃক্ষ, প্রাণী, চন্দ্র, সূর্য সবই স্রষ্টা- এ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- অপরদিকে মুসলিমদের বিশ্বাস হলো, মানুষ নিজে এবং চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছুই 'আল্লাহর'। এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। হিন্দু ও মুসলিমদের মূল পার্থক্য হলো, তারা (হিন্দুরা) বলে **'সবকিছুই ঈশ্বর** (স্রষ্টা)' আর আমরা মুসলিমরা বলি **"সবকিছুই স্রষ্টার** তথা **আল্লাহর"**।

আসুন আমরা এক হই । কিভাবে এক হব ?

Youtube এ ভিডিও ডাউনলোড লিংক-- https://www.youtube.com/watch?v=R5Dw5fIugE0
"বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা" বইয়ের pdf ডাউনলোড লিংক
http://www.banglainternet.com/hadith/dr_jkr_nyk_all_p1.pdf

www.QuranerAlo.com

আল্লাহ্ পবিত্র আল- কুরআনে (৩) নং সুরা আল-ইমরান, ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন যে ঃ **"বল, 'হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো 'ইবাদাত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম** (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পনকারী)।"[৭]
তাই আসুন আমরা এক স্রষ্টার উপাসনা করবো এ বিষয়ে একমত হই ।

আসুন আমরা স্রষ্টা সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ বিশেণ্ঢষণ করে উভয়ের মাঝে মিল-অমিল বের করার চেষ্টা করি। স্রষ্টা সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের কিতাব থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করা হলো।

উপনিষদ:

১. *"একম ইভাদ্বিতীয়ম" অর্থ্যাৎ "তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া"।* [Chandgya উপনিষদ ৬: ২: ১]
২. *"না কছ্য কছুজ জানিত তনা কধিপহ" অর্থ্যাৎ "তার কোন মাতা-পিতা নেই, কোন প্রভূও নেই"* [Svetasa vatara শ্বেতাস্বতরা উপনিষদ, অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-৯, দ্বিতীয় খন্ড পৃ : ২৬৩]
৩. *"নৈনাম উর্ধভাম না তির্যনকাম না মধ্যে না পরিজাগ্রতভাত না তস্য প্রাতিমে অস্তি যস্য নম মহত ইয়াছা" অর্থাৎ তার কোন প্রতিকৃতি নেই এবং তার নাম মহিমান্বিত"* [The Principal উপনিষদ কৃত এস. রাধাকৃষ্ণ পৃ ৭৩৬ ও ৭৩৬, প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলী,ভলিউম-১৫, উপনিষদ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা -২৫৩]

উপরোক্ত ৩টি শেণ্ঢাকের সাথে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দুটির সাথে তুলনা করুন- (১১২) নং সুরা ইখলাস এর ১-৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন - **"বলঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"**

পবিত্র কুরআনের (৪২) নং সূরা আশ-শূরার ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন **"কোন কিছুই তার সদৃশ নয়"** ।

বেদ:

হিন্দু ধর্মের সকল গ্রন্থের মধ্যে বেদকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসেবে ধরা হয়। বেদ প্রধানত চার প্রকার । যেমন- ১. যজুর্বেদ ২. অথর্ববেদ ৩. ঋগবেদ ৪. সামবেদ।

যজুর্বেদ:

১. যজুর্বেদের নিমোক্ত শেণ্ঢাকগুলো লক্ষ্য করুন: *"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"* অর্থাৎ *"স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই "।* [যজুর্বেদ অধ্যায় -৩২ অনুচ্ছেদ- ৩]
২. এতে আরও আছে,*"যেহেতু তিনি চিরঞ্জীব, তাই তাঁকেই উপাসনা করতে হবে' তার কোন প্রতিকৃতি (প্রতিমা/মূর্তি) নেই, তাঁর গৌরব মহিমান্বিত। তিনি একাই*

৭ মুসলিম মানে - এক আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পনকারী/আনুগত্যকারী।

www.QuranerAlo.com

Contents

সূর্যের মত সকল আলোকজ্জ্বল বস্তু প্রতিপালন করেন। তিনি যেন আমার কোন ক্ষতি সাধন না করেন, এটাই আমার প্রার্থনা। তিনি চিরঞ্জীব , তাই তাঁকেই উপাসনা করতে হবে" । [যজুর্বেদ ,দেবি চাদঁ এম.এ পৃ.৩৭৭]

৩. যজুর্বেদে আরও উল্লেখ আছে-*"অন্ধতম প্রভিশান্তি ইয়ে অশম্ভুতি মুপান্তে' "যারা অশম্ভুতির পূজা করে তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে' । 'অশম্ভূতি হচ্ছে প্রাকৃতিক বস্তু: যেমন বায়ূ, পানি, আগুন ইত্যাদি।" আরও বলা হয়েছে তারা অধিকতর বেশি অন্ধকারে পতিত হয় যারা শাম মূর্তির পূজাঁ করে, শাম মূর্তি হচ্ছে মানুষের তৈরি বস্তু যেমন- টেবিল, চেয়ার, প্রতিমা/মূর্তি/ভাষ্কর্য ইত্যাদি* । [যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ অনুচ্ছেদ ৯]

অথর্ববেদ:

অথর্ববেদের নিচের শ্লোকগুলো বিবেচনায় আনুন–

১. *"দেব মহা অছি" " স্রষ্টা সত্যিই সুমহান"* [অথর্ববেদ, বই-২০, অধ্যায়-৫৮, ভলিউম-৩]

২. *"প্রকৃতপক্ষে তুমি সুমহান, সত্যিই অদ্বিতীয়, তোমার ক্ষমতা সুবিশাল, আর যেহেতু তুমি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী তাই তোমার বড়ত্বকে সম্মান করি; সত্যিই তুমি সুমহান, প্রবল ক্ষমতাধর প্রভূ তুমি"* । [*অথর্ববেদ সংহতি, ভলিউম-২* William Dmight Whitney Page. 910]

পবিত্র কুরআনের **১৩** নং সূরা রাদ এর ৯ নং আয়াত বলছে **"তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।"**

ঋগবেদ:

১. সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো 'ঋগবেদ', হিন্দুরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ঋগবেদ বর্ণনা করে যে, *"জ্ঞানীরা এক স্রষ্টাকে বিভিন্ন নামে ডাকে"* । [ঋগবেদে বই ১ : অধ্যায় ১৬৪ : ভলিউম ৪৬]

২. ঋগবেদে আরও বর্ণিত আছে *"মা চিদান্যদভি শাংসত" ও বন্ধু , স্রষ্টার সাথে কাউকে ডাকিওনা"* [ঋগবেদ বই --৮: অধ্যায় -১: -ভলিউম -১, ঋগবেদ সংহিতি ভলিউম-৯, পৃ: ১ ও ২ স্বমী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার]

৩. *"জ্ঞানী সন্যাসীরা তাদের মন ও চিন্তা-ভাবনাকে সেই সুমহান সত্যের প্রতি নিয়োগ করে, যা সর্বব্যাপী, মহান ও সর্বজ্ঞ। তিনি একক, সবকিছুর কার্যকলাপ জানেন, সবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজের প্রতি চালনা করেন, সত্যিই তিনি সর্ব শক্তিমান স্রষ্টা "* [ঋগবেদ অধ্যায় ৫ : অনুচ্ছেদ ৮১ ঋগবেদ সংহিতি ভলিউম-৬, পৃ: ১৮০২ ও ১৮০৩ স্বমী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার]

সার কথা: উপরের এ সকল শ্লোক থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিন্দু ধর্মেও তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদ (একক স্রষ্টার ইবাদত) স্বীকৃত। তাই ইসলাম ও সনাতন (হিন্দু) ধর্মের মধ্যে প্রথম সাদৃশ্য হল এক স্রষ্টা (ঈশ্বর) তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন স্রষ্টা (ঈশ্বর) নেই অর্থাৎ এক সৃস্টিকর্তার ইবাদত করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা মুসলিমরা ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সবাই একমত হলাম। আসুন দেখি শিখ ধর্মে স্রষ্টা সম্পর্কে কি বলে ?

www.QuranerAlo.com

শিখ ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা

শিখ ধর্ম এটাও হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত। গুরু নানক একটি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্রে)। হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহন করেন; কিন্তু তিনি গভীরভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

স্রষ্টা (ঈশ্বর) সম্পর্কে ধারণা দিতে শিখরা তাদের পবিত্র গ্রন্থের শুরুতে মূলমন্ত্র উদ্ধৃত করে থাকে-যেমন- শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবের প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদেই বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আবার জাপূজি মূলমন্ত্রও বলা হয়। সেটি হলো:

"একজন স্রষ্টাই বিদ্যমান যিনি সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে মুক্ত। যিনি অমর, স্বয়ম্ভু অর্থ্যাৎ নিজেই জন্মেছেন, সুমহান এবং করুনাময়"।

শিখধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে এবং তারা 'অবতারবাদ' এ বিশ্বাস করে না। 'অবতারবাদ' হলো স্রষ্টার মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন। যেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারন সৃষ্টিকর্তা মহান । তার মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন নাই এবং এটা অযৌক্তিক। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এই হলো শিখ ধর্মে স্রষ্টার ধারণা।

জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা

জরথুস্ত্রীয় ধর্ম প্রাচীন আর্য ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম। এ ধর্ম 'পারসি ধর্ম' হিসেবেও পরিচিত। এ ধর্মের মূল গ্রন্থ হলো 'দসতির' ও 'আবেস্তা'।

দসতির অনুসারে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য :

দসতির অনুসারে 'আহুরা মাজদার' এ স্রষ্টার নিম্নের গুনাবলি রয়েছে-

১. তিনি একজনই। ২. তার সদৃশ কিছু নেই ৩. তার কোন উৎপত্তি নেই বা শেষ নেই। ৪. তার কোন পিতা নেই, মাতা নেই, স্ত্রী নেই ও সন্তান নেই। ৫. সৃস্টির ন্যায় তার কোন আকার-আকৃতি নেই বরং তিনি স্বআকার। ৬. কোন দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে পায়না, এমনকি কোন চিন্তা শক্তিও তাঁকে কল্পনা করতে পারেনা। ৭. তিনি মানবীয় ধারণা- কল্পনার বহু উর্দ্ধে। ৮. তিনি তোমার নিজস্ব সত্ত্বার চেয়ে অধিকতর নিকটে ।

'আবেস্তা' অনুসারে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য:

আবেস্তা-তে 'গাথা' ও 'ইয়াসনা' আহুরা মাজদ'র এ স্রষ্টার যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে তা হলো-

- *সৃষ্টিকর্তা* [ইয়াসনা,৩১ : ৭ ও ১১, ৪৪ : ৭, ৫০ : ১১]
- *সর্বশক্তিমান-সুমহান* [ইয়াসনা ৩৩ : ১১, ৪৫ : ৬]
- *করুণাময়-'হুদাই'* [ইয়াসনা ৩৩ : ১১, ৪৮ : ৩]
- *দানশীল-'স্পেন্তা'* [ইয়াসনা ৪৩ : ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ৪৫ : ৫, ৪৬ : ৯]

ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার ধারনা

ইয়াহুদি ধর্ম এর অনুসারীদেরকে 'ইয়াহুদি' নামে অভিহিত করা হয়। তারা নিজেদেরকে মূসা ﷺ এর প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে। আসুন দেখি ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা সম্পর্কে কি বলে?

নিম্নোক্ত শ্লোকটি বাইবেল[৮] 'পুরাতন নিয়ম' (Old Testament) এর 'ডিওটারেনমি' অধ্যায়ে উদ্ধৃত মূসা ﷺ এর উপদেশনামা থেকে গৃহীত।

১. *"শামা ইজরাঈলিউ আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইকহাদ।"*
এর অর্থ- *"হে ইসরাঈলীরা শোনো, প্রভূ আমাদের স্রষ্টা, তিনি মাত্র একজনই।"*
[বাইবেল ডিওটারেনমি ৬ : ৪]

২. *"আমিই একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভূ, আমি ব্যতীত কোন উদ্ধারকারী নেই"* [বাইবেল, ইসাইয়াহ ৪৩ : ১১]

৩. ইয়াহুদি ধর্মে প্রতিমা (মূর্তি/ভাস্কর্য) পূজাকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে নিন্দা করা হয়েছে-

"তোমাদের অন্য কোন প্রভূ নেই। তাই তোমরা আমার সাথে অন্য কাউকে আহবান করিওনা। তোমরা কোন প্রতিমূর্তি তৈরী করিওনা। উপরের আকাশ, পৃথিবী ও জলে অবস্থানরত কোন কিছুরই মূর্তি তৈরি করিওনা। তুমি কোন মূর্তির সামনে মাথা নত করিওনা, তাদেরকে দেখিওনা। সিজদা শুধুমাত্র আমারই জন্য আর আমি এ ব্যাপারে খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।" [বাইবেল, এক্সোডাস ২০ : ৩-৫]

সুতরাং ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করা উচিত। স্রষ্টার প্রতিমা (মূর্তি/ভাস্কর্য) তৈরী করা নিষেধ। অতএব ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীও আমরা একমত হলাম এক সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করা উচিত।

৮ অনলাইনে বাইবেলের নিউ-টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন অনুবাদ দেখতে এই লিংকগুলো ভিজিট করুন।
১. মূল হিব্রু ভাষা: https://www.wordproject.org/bibles/he/index.htm
২. ইংরেজী অনুবাদ: https://www.wordproject.org/bibles/kj/index.htm
৩. বাংলা অনুবাদ: https://www.wordproject.org/bibles/ben/index.htm

www.QuranerAlo.com

খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে স্রস্টার ধারণা

যিশু খ্রিস্ট তথা ঈসা ﷺ এর নামানুসারে খ্রিষ্টধর্মের নামকরন করা হয়েছে। ঈসা ﷺ ইসলাম ধর্মেও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্ট ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঈসা ﷺ এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

খ্রিষ্টধর্মে এ স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ইসলামে ঈসা ﷺ-এর মর্যাদা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

- কেবলমাত্র ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাতে ঈসা ﷺ এর উপর বিশ্বাস পোষন ঈমান তথা বিশ্বাসের মৌলিক নীতি হিসেবে মনে করা হয়। ঈসা ﷺ -কে নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে কোন মুসলিম-ই পুরোপুরি মুসলিম হতে পারে না।
- আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি, ঈসা ﷺ মহান স্রষ্টা আল্লাহর একজন মর্যাদাশালী নবী ও রাসূল ছিলেন। তিনি কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই মহান স্রষ্টা আল্লাহর আদেশে অলৌকিকভাবে মারিয়াম ﷺ এর গর্ভে জন্মগ্রহন করেন, যা আধুনিক কালে অনেক খ্রিষ্টান মানতে চান না। তিনি সৃস্টিকর্তার পুত্র (সন্তান) নন, বরং তার নবী ও রাসূল এবং তার একনিষ্ঠ বান্দা।
- তিনি মহান স্রষ্টা আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবন দান, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে পারতেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয়ই যদি ঈসা ﷺ কে ভালবাসে ও সম্মান করে, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে মূল পার্থক্য:

ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷺ-কে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার গুনসম্পন্ন সত্তা ও উপাসনার যোগ্য মনে করে, যা ইসলাম স্বীকার করে না. কারন কোন মানুষ সর্বশক্তিমান স্রষ্টার গুনে গুনান্বিত হতে পারে না এটা অযৌক্তিক। আমরা মুসলিমরা যিশুখ্রিষ্ট তথা ঈসা ﷺ কে নবী হিসেবে স্বীকার করি, কিন্তু তিনি শেষ নবী নন। খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ পড়লে জানা যায় যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা ﷺ কখনো নিজেকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বলে দাবি করেন নি। মূলত বাইবেলের (নিউ টেস্টামেন্ট) নতুন নিয়মে এ জাতীয় দাবি সম্বলিত একটি বাক্যও খুজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি নিজে বলেছেন *'আমিই ঈশ্বর/স্রষ্টা'* অথবা *'আমার ইবাদত/উপাসনা কর'*। বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

- *"আমার স্রষ্টা আমার চাইতে সুমহান"* [গসপেল অফ জন ১৪ : ২৮]
- *"আমি স্রষ্টার ইশারায় মন্দকে দূরিভূত করি।"* [গসপেল অফ লুক ১১ : ২০]

www.QuranerAlo.com

- *"আমি নিজে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারি না, যেহেতু আমি শ্রবণ করি ও বিচার করি, আর আমার বিচার সঠিক, কারণ আমি আমার সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তার ইচ্ছা ছাড়া তা নিজের ইচ্ছায় করি না।"* [গসপেল অফ জন ৫: ৩০]

যীশু খ্রিস্টের (ঈসা عليه السلام) মিশনঃ-

তিনি এসেছিলেন তাওরাতের বিধানকে পরিপূর্ন করতে-

মথি লিখিত সুসমাচারের (Gospel) নিম্নোক্ত বর্ননায় ঈসা عليه السلام এর উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে-

"তোমরা এরকম ভাবিওনা যে, আমি এসেছি নবীগণ বা তাদের বিধান ধ্বংস করতে , আমি ধ্বংস করতে আসিনি বরং পরিপূর্ণ করতে এসেছি। মূলত আমি তোমাদেরকে বলি যে, আসমান ও যমিন যতদিন থাকবে ততদিন বিধানসমূহের একটি অক্ষরও খন্ডন হবেনা, যতক্ষন না এটি পরিপূর্ণ হয় এবং কারা এমন রয়েছে যে, বিধানসমূহের একটি অক্ষরও খন্ডন করবে এবং মানুষকে তাই শিক্ষা দেবে ও স্বর্গ রাজ্যেও আশা করবে। আর যারা এগুলো রাখবে এবং মানুষকে শিক্ষা দিবে তারা কিভাবে স্বর্গ রাজ্যের আশা করবে। যদি তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থের বাইরে কিছু কর তাহলে তোমরা কিছুতেই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না।" [বাইবেল .গসপেল অফ মথি ৫: ১৭-২০]

স্রষ্টাই যিশু খ্রিস্ট বা ঈসা عليه السلام কে পাঠিয়েছিলেন:

বাইবেলের নিচের বর্ণনায় যিশু খ্রিষ্টের(ঈসা عليه السلام)–এর প্রচারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে-

- *"এ এক চিরন্তন জীবন যাতে তুমি বুঝতে পারবে সৃস্টিকর্তা একজনই। তিনিই সত্য, যিনি ঈসা عليه السلام কে পাঠিয়েছেন।"* [বাইবেল যোহন ১৭ : ৩]
- *"একজন লোক ঈসা عليه السلام এর নিকটে এল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, "হে মহান শিক্ষক, স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমি কি কি ভাল কাজ করতে পারি?" তারপর ঈসা عليه السلام উত্তর দিলেন, "কেন তুমি আমাকে মহান বলেছ? একজন ছাড়া কেউই মহান নয়, তিনি সৃষ্টিকর্তা। আর যদি তুমি স্বর্গে যেতে চাও তাহলে (স্রষ্টার) বিধানসমূহ মেনে চল"।* [বাইবেল মথি ১৯: ১৬-১৭]

সর্বপ্রথম নির্দেশ সৃস্টিকর্তা এক-অদ্বিতীয়:

বাইবেল খ্রিস্টানদের ত্রিত্ত্ববাদ [ট্রিনিটি] অর্থ্যাৎ তিন ঈশ্বরে (স্রষ্টায়) বিশ্বাস কখনো সমর্থন করে না। একদিন ঈসা عليه السلام কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, স্রষ্টার (ঈশ্বরের) সর্বপ্রথম নির্দেশ কোনটি?

এর উত্তরে তিনি তা-ই বললেন যা মূসা عليه السلام বলেছিলেন

"শামা ইসরাইলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইকহাত'

অর্থ:*"হে ইসরাঈলীরা শোনো, প্রভূ আমাদের স্রষ্টা, তিনি মাত্র একজনই।"* [মার্ক ১২ :২৯]

তাই খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থেও আমরা দেখলাম-একেশ্বরবাদ তথা তাওহীদ (একত্ববাদ) স্বীকৃত। অর্থাৎ সৃস্টিকর্তা কেবল একজনই এবং শুধুমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা মুসলিমরা এবং খ্রিষ্টানরাও একমত হলাম। এবার আসুন জানি ইসলাম স্রষ্টা সম্পর্কে কি বলে ?

www.QuranerAlo.com

ইসলামে স্রষ্টার ধারণা

সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটির বেশি। ইসলাম মানে হচ্ছে, *"আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পন করে দেয়া"*। মুসলিমরা আল্লাহর বানী হিসেবে কুরআনকে বিশ্বাস করে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল (অবতীর্ণ) হয়েছিল।

ইসলামে স্রষ্টার পরিচয়:

ইসলামে সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় মহিমান্বিত কুরআনের সূরা ইখলাসের চারটি আয়াতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে

"বলঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" [সূরা ইখলাস-১১২ ঃ ১-৪]

সূরা ইখলাস-স্রষ্টাতত্ত্বের কষ্টিপাথর:

পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাস হচ্ছে স্রষ্টাতত্ত্বের কষ্টিপাথর। যে কোন ব্যক্তি, বস্তু অথবা স্রষ্টাকে প্রকৃত স্রষ্টা হিসেবে যাচাই করতে হলে তা অবশ্যই এই সূরার চারটি আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে ,তাহলে প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যাবে। ফলে মিথ্যা স্রষ্টা ও কারও স্রষ্টা হবার অলিক দাবী এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে বাতিল করা যেতে পারে।

ইসলামে সৃষ্টিকর্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং তারই ইবাদত করতে হবে।
২. সৃষ্টিকর্তা কখনোই মানুষের রুপ ধারণ করেন না বা মানুষ হন না ।
৩. সৃষ্টিকর্তা কখনোই সৃষ্টির মত কর্ম সম্পাদন করেন না ।
৪. সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে কোন ভায়া মাধ্যম লাগে না।
৫. সৃষ্টিকর্তা কখনো ভুলে যাননা বা ভুল করেন না ।
৬. সৃষ্টিকর্তাই নির্দেশিকা কিতাব/গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন ।
৭. সৃষ্টিকর্তাই রাসূল/বার্তাবাহককে বাছাই ও প্রেরণ করেন ।
৮. সৃষ্টিকর্তা তার সকল গুণাবলির ক্ষেত্রে অংশীদারহীন এককত্বের অধিকারী।

সৃষ্টিকর্তাকে আমরা কি নামে ডাকি?

আমরা মুসলিমরা সৃষ্টিকর্তাকে ইংরেজী শব্দ 'God'(গড) বা ঈশ্বর নামে ডাকার পরিবর্তে আরবি শব্দ 'আল্লাহ' নামে ডাকতে অধিকতর পছন্দ করি। কারন আরবী শব্দ الله 'আল্লাহ' একক, কিন্তু ইংরেজী 'God'(গড) শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি 'God'(গড) এর সাথে S যোগ করেন তাহলে হবে 'Gods' (গডস), যার অর্থ হয় একাধিক 'ঈশ্বর' বা 'একাধিক স্রষ্টা'। কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র একজনকেই বুঝায় এবং শব্দটি একবচন যার কোনো বহুবচন নেই। 'আল্লাহ'

শব্দটি এমন এক সত্তার জন্যে নির্ধারিত, যিনি অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অধিকারী, যিনি যাবতীয় পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার সকল গুণাবলিতে ভূষিত এবং সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা, অপবিত্রতা ও যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

আসুন আল্লাহ সম্পর্কে জানি : মহান আল্লাহর পরিচয়ঃ

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন --------

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে ? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।" [সূরা বাকারা (আয়াতুল কুরসি) ২ঃ ২৫৫]

তিনি আরও বলেছেন মহান প্রভু, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তার নাম হচ্ছে আল্লাহ্। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। কারণ যে কোন গুণবাচক নাম দিয়েই আল্লাহ্র কথা বলা হোক না কেন, সব নাম দ্বারা আল্লাহ্কেই ইঙ্গিত করা হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র ও মহান।" [সূরা হাশর ৫৯ : ২৩]

বেশিরভাগ জন্মগত মুসলিম তাদের বাবা-মা সালাত (নামাজ) পড়েন, সিয়াম (রোজা) পালন করেন সেই সুবাদে তারাও করেন। কিন্তু কাকে খুশি করার জন্য এগুলো করেন ? তাঁর পরিচয় কি ? তিনি কে ? এসব নিয়ে কখনও পড়াশোনা করতে দেখা যায় না। মৃত্যুর আগ পর্যন্তও যে মুসলিম আল্লাহ্কে চেনে না তার চেয়ে দুর্ভাগা বোধহয় আর নেই। এখানে কিছু তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে আপনার জানা থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র পরিচয় হিসেবে হয়ত ভেবে দেখেননি। তো চলুন জেনে নেই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কে ? কেন তার ইবাদত করা হয়?

যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের প্রতিপালক, তাঁকে সারা দুনিয়ার সকল ধর্মের গ্রন্থে স্রষ্টা (প্রভু) বলে ঘোষনা করা হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কেবল ইসলামের নয়, সকল ধর্মের এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাস করেননা (নাস্তিক) সকলেরই স্রষ্টা ও ইবাদতের যোগ্য একমাত্র রব (প্রতিপালক)।

মহান আল্লাহ কোথায়?

মহান আল্লাহ আরশে আযীমে আছেন। যেমন তিনি বলেছেন–" **আরশে দয়াময় সমুন্নত আছেন।"** [সূরা ত্বহা ২০: ৫]

আল্লাহ কি সবখানে বিরাজমান?

না, সত্তাগতভাবে তিনি সবখানে বিরাজমান নন বরং তার জ্ঞান গোটা বিশ্বকে ঘিরে আছে। সবকিছুই তার চোখের সামনে। তার জ্ঞানের বাইরে এই মহাবিশ্বের কিছুই নেই। সবখানে তাঁর রহমত, বরকত, দয়া, কল্যাণ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। তিনি সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে সমুন্নত। প্রমাণ নিচের আয়াতগুলি-- **"আরশে[৯] দয়াময় সমুন্নত আছেন"** [সূরা ত্বহা ২০ : ৫]

"তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না ? যাতে তোমরা জানতে পারবে যে, কেমন (ভয়ানক) ছিল আমার সতর্কবাণী।" [সূরা মুলক ৬৭: ১৭]

"আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলীকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন, যা তোমরা দেখছ, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। ।" [সূরা রাদ ১৩: ২]

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "*মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।*"[১০]

আল্লাহ্ মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন ?

আল্লাহ মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ।
যেমন--মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন-

- **"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।"** [সূরা আয-যারিয়াত ৫১ : ৫৬]

এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ :

- **"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।"** [সূরা আন-নাহাল ১৬:৩৬]

---

৯ এ আয়াতে আল্লাহর একটি ক্রিয়াবাচক গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে استواء (ইসতাওয়া) বা আরশের উপর উঠা। ইমাম মালেককে এ গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, استواء (ইসতাওয়া) এর অর্থ জানা আছে। তবে তার ধরন (كيفية) জানা নেই। এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ওয়াজিব এবং এর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদআত। এ নীতিটি আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০ সহীহ বুখারী -১১৪৫, সহীহ মুসলিম -৭৫৮।

www.QuranerAlo.com

তাই, আমাদের সমস্ত ইবাদত (ইবাদতের অর্থঃ সম্পূর্ণ আনুগত্য বা বশ্যতা) আল্লাহ্র প্রতি হওয়া উচিত। মানুষের প্রবর্তিত প্রচলিত মানবরচিত মতবাদ বা সিস্টেমকে আল্লাহ্র আইনের (শরিয়াহর) ঊর্ধ্বে মনে করা, সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার উপরে স্থান দেয়াকেই বোঝায়। সরকার ব্যবস্থার কারণে সব জায়গায় আল্লাহ্র আইন পালন করা সম্ভব না হলেও বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ্র আইনই সবচেয়ে উপরে। নয়ত আল্লাহ্র প্রভুত্বকে অবজ্ঞা করা হবে। একইভাবে তাবিজ ব্যবহার করা, পীর-পুরোহিত, ঈমানদার-নেককার মৃত ব্যক্তির কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন সাহায্য চাওয়া যা কেবল আল্লাহ্ই পূরন করতে পারেন, তা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অংশীদার করা (শিরক), চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র প্রভুত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল। সরাররি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা না করে ভায়া/মাধ্যম ব্যবহার করাও একই ধরনের শিরক। এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে ।

মহান আল্লাহর গুণাবলী :

আল্লাহ নিরাকার নন। তবে তার আকার জানা নেই। তিনি তার মতই-স্বআকার। আল্লাহর সাথে সৃষ্টির কারও তুলনা (মিল) করা চলবে না। কুরআনে আল্লাহ তাঁর সিফাতে জাত (সত্তা) এবং গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজস্ব সত্তার বর্ণনায় চেহারা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, হাসি, আনন্দ, অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ, ইত্যাদি উল্লেখ করছেন, তবে তার ধরন (গঠন) বুঝা আমাদের জ্ঞানের বাইরে কেননা আল্লাহ বলেন- **"তাঁর মত কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।।"** [সূরা আশ্-শূরা, ৪২: ১১] **"সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।"** [সূরা আন্-নাহ্ল, ১৬ : ৭৪]

আল্লাহর দেখা ও শোনা :

মহান আল্লাহ বলেন---**"আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।"** [সূরা ত্ব-হা ২০: ৪৬]
তিনি আরও বলেছেন---**"আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"** [সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: ১৮]
"আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে অবশ্যই সব খবর রাখেন এবং সব দেখেন।" [সূরা ফাত্বির ৩৫ : ৩১]
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "*জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনার কওমের লোকেদের কথা শুনেছেন এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে তাও তিনি শুনেছেন।*"[১১]

আল্লাহর কথোপকথন :

কুরআনে বলা হয়েছে---**"আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন "**। [আন-নিসা, ৪: ১৬৪] **"আর যখন আমার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মূসা এসে উপস্থিত হল আর তার সাথে তার রব কথা বললেন।"** [আল-আ'রাফ ৭ : ১৪৩] **"তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হে মূসা! আমি আমার**

১১ সহীহুল বুখারী: ৭৩৮৯ ।

www.QuranerAlo.com

Contents

রিসালাত (যা তোমাকে দিয়েছি) ও আমার বাক্য (যা তোমার সঙ্গে বলেছিলাম তার) দ্বারা সকল লোকের মধ্য থেকে তোমাকে নির্বাচিত করেছি। কাজেই যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ কর আর শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। " [সূরা আল-আ'রাফ ৭: ১৪৪]

আল্লাহর হাসি ও আনন্দঃ

আল্লাহর হাসি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"দু'ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তাওবাহ কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে গণ্য হয়েছে।"[১২]

আল্লাহর আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন.

"বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশী হন যে মরু-ভূমিতে নিজ সাওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তার সাওয়ারীটি তার থেকে হারিয়ে গেল। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি বৃক্ষের ছায়ায় এসে বিশ্রাম করে এবং তার সাওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সাওয়ারীটি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। অমনিই সে তার লাগাম ধরে ফেলে। তারপর সে অত্যধিক আনন্দের কারণে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। (এখানে) অত্যধিক আনন্দের কারণে সে ভুল করে (এ কথা বলে) ফেলেছে।"[১৩]

আল্লাহকে কি দেখা যায় ?

না, পৃথিবীর জীবনে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়---

মহান আল্লাহ বলেনঃ **"কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। '** [সূরা আনআম ৬ : ১০৩]

মুসা ﷺ-এর কওম তাঁর কাছে দাবী জানিয়ে ছিল আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখানোর ঃ-

"স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহকে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কক্ষনো বিশ্বাস করব না'। তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করেছিল আর তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছিলে।" [সূরা বাকারাহ ২:৫৫]

মুসা তাঁর রবকে বললেন **"হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে**

---

১২ সহীহুল বুখারী: ২৮২৬ ।
১৩ সহীহ মুসলিম: ২৭৪৭ ।

www.QuranerAlo.com

দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।' [সূরা আ'রাফ ৭:১৪৩]

মু'মিনরা জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে ?

আল্লাহর দেখা (সাক্ষাত) একমাত্র মু'মিন (বিশ্বাসী) বান্দাহর জন্যই। কাফিররা (অবিশ্বাসিরা) এ নি'আমাত থেকে বঞ্চিত হবে। আখেরাতে আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য আয়াত ও বাণী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,**"সেদিন কতক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"** [সূরাঃ আল-কিয়ামাহ, ৭৫: ২২-২৩]

"যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) **রয়েছে; এবং অতিরিক্ত কিছুও বটে; আর না তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।"** [সূরাঃ ইউনুস, ১০: ২৬]

এই আয়াতে *"যিয়াদাহ"(অতিরিক্ত কিছু)"*-- বলতে আল্লাহর দর্শন (সাক্ষাত)-কে বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহর দীদার (দর্শন) কে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, **"বলঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।।"** [সূরাঃ আল-কাহফ, ১৮ : ১১০]

আবদুল্লাহ ইবন কায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"দুটি জান্নাত এমন যে, এগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রুপার তৈরি। অন্য দুটি জান্নাত এমন, যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের তৈরি। "আদন" নামক জান্নাতে জান্নাতিগণ আল্লাহর দীদার (দেখা) লাভ করবেন। এ সময় তাঁদের ও আল্লাহর মাঝে তাঁর মহিমার চাঁদর ব্যতীত আর কোনো অন্তরায় থাকবে না।"[১৪]

আতা ইবন ইয়াযীদ আল-লায়সী থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে অবহিত করেছেন যে--*"কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনোরূপ অসুবিধা হয়? তারা বললো, না– হে আল্লাহর রাসূল। তিনি আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনোরূপ অসুবিধা হয়? সবাই বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঐরূপ স্পষ্টভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে।*[১৫]

---

১৪ মুসলিম হাদীস নং ১৮০ ।

১৫ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২ ।

www.QuranerAlo.com

আল্লাহকে চেনার উপায়?

যেহেতু আমাদের প্রতিপালক আমাদের কাছে অদৃশ্যমান, তাই তাঁকে চেনার উপায় কি? চলুন দেখা যাক ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে, স্বয়ং আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর সৃষ্টির কাছে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেন।

- (হে মুহাম্মাদ) **"বলঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।"** [সূরা এখলাস ১১২ ঃ ১-৪]

আল্লাহ্ এই বিশ্বজগৎ এবং এর অধিবাসীদের একমাত্র রব (সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক), এবং এই সার্বভৌমত্ব তার কাছে কোন কঠিন কিছু নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে কোন রকম তুলনা বা সাদৃশ্য থেকে অনেক উর্ধ্বে, তাই তাঁর কোন সন্তান থাকা সম্ভব নয়, বা তিনি কারও সন্তান হতে পারেন না। তিনি দেখতে কেমন তা আমাদের পৃথিবীর চোখে ও মস্তিষ্কে দেখা বা বোঝা সম্ভব নয়। তিনি অদ্বিতীয় তাঁর সাথে তুলনাযোগ্য কোন কিছুই নেই।

- **"আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে। আর তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যুদেন এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই অধিকারে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? "** [সূরা আল-মুমিনুন ২৩ : ৭৮-৮০]

আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই:

- মহান আল্লাহ বলেন **"তাঁর (আল্লাহর) সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ অতি পবিত্র! "** [সূরা আল-মুমিনুন ২৩ : ৯১]
- মহান আল্লাহ বলেন--**"জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"** [সূরা আরাফ- ৭:৫৪]

আসুন মহান আল্লাহ সম্পর্কে সংক্ষেপে জানি:

এখন আমরা কুরআন ও হাদীসের নির্যাস থেকে আল্লাহ সম্পর্কে সংক্ষেপে জানবঃ

আল্লাহ আমাদের রব (পালনকর্তা)। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মহা পরাক্রমশালী প্রবল প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোনো অংশীদার (শরীক) নেই। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি; তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। আল্লাহর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ নেই। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি চন্দ্র-সুর্যের উদয় অস্ত ঘটান। তিনি সাগরের বুকে ঢেউ তোলেন। তিনিই পাহাড়কে দৃঢ়তা দান করেছেন যাতে পৃথিবী হেলে না পড়ে। তিনি জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন। এ ছাড়া মানুষের জীবন ধারণের জন্য নানা রকম ফলমূল পানি তাজা শাক শবজি উৎপন্ন করেছেন। তিনি যাকে খুশি ধনী করেন; যাকে খুশি তাকে ভিখারী বানান।

যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন; যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি যা ইচ্ছা (খুশি) তাই করেন। আল্লাহ আমাদের মনের গোপন কথাও জানেন। জমীনে বসবাসরত ছোট একটি প্রাণীকে কেউ না দেখলেও তিনি ঠিকই দেখতে পান। আমরা অপরাধী তিনি গাফুরুর রাহীম। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মালিক। তিনি একসাথে সকল সৃষ্টিকে দেখেন। তিনি সবার কথা শোনেন। তিনি আমাদেরকে খাওয়ান। আমাদেরকে পান করান। অসুখ হলে তিনি আরোগ্য দান করেন। এই পৃথিবীর সকল কিছু তিনি সৌন্দর্যমন্ডিত করে তৈরী করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। একমাত্র তিনিই নির্ভুলভাবে কাজ করেন। তিনি কোনো কিছু ভুলে যান না। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি বড়ই ভালোবাসেন। মানুষ নিজকে নিজের ছেলে মেয়েকে যত ভালোবাসে আল্লাহ তার চেয়ে বেশি তার বান্দাকে ভালোবাসেন। বিষয়টি বিবেকের বিচারে গভীর ভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। কারন আমাদের সুন্দর চেহারা হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নাক-মুখ, চোখ আল্লাহ খুব সুন্দর করেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাঁয়ালা আসমান-জমিন, সৌরজগৎ, আত্মার জগৎ, বেহেশত (স্বর্গ) দোযখ (নরক), ফেরেশতা, জীন-ইনসানসহ গোটা মাখলুকাত অর্থাৎ জীবজন্তু, জড়বস্তু এবং সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। এক কথায় বলা যায় গোটা আকাশ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। তিনি সমস্ত জীবের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। তিনি সকল জীবের পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। আল্লাহ তখনো ছিলেন যখন আর কিছু ছিলো না। আল্লাহ তখনো থাকবেন যখন কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ আল্লাহ চিরকাল ছিলেন, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকবেন। চিরন্তন চিরস্থায়ী অস্তিত্ব তাঁর। তিনি ধ্বংসের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। আল্লাহকে কোনো সৃষ্টি দেখতে পায় না। আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে কোন কিছুই থাকা সম্ভব নয়। আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন। আল্লাহর শক্তি অসীম। আল্লাহর সৃষ্টি-ক্ষমতার শেষ নেই। আল্লাহ জীবন দেন। আল্লাহ মৃত্যু দেন। আল্লাহ জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন।

আল্লাহ পৃথিবীকে মাটি, বন, ঘাস, উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, পানি, সামুদ্রিক, মাছ, পাখি, পশু, তাপ-বিদ্যুৎ, খনিজ ইত্যাদি সম্পদে ভরপুর করেছেন। আল্লাহ মাটির গভীরে সোনা, রূপা, হীরা, লোহা, তামা, কয়লা, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি সম্পদ মওজুদ রেখেছেন। আল্লাহ পানি সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে যমীনকে সিক্ত করা, প্রাণীর পিপাসা মেটানো ও দানা-বীজকে অংকুরিত করার গুণ দান করেছেন। আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে তাপ ও আলো বিতরণের গুণ দান করেছেন। আল্লাহ বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি করেছেন এবং এটিকে বিভিন্ন যন্ত্র চালানো ও ভালবের ভেতর সঞ্চালিত হয়ে আলো ছড়ানোর গুণ দান করেছেন। আল্লাহ পানি থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ ও মেঘ থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি করেন। আল্লাহর নির্দেশে বায়ু প্রবাহিত হয়, বায়ুতে ভর করে মেঘ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ

মধুসহ বিভিন্ন দ্রব্যে রোগ নিরাময়ের গুণ দান করেছেন। আল্লাহ নূর (আলো) থেকে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে তাঁর অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা দেননি। ফেরেশতারা আল্লাহর বিশ্বস্ত অনুগত কর্মচারী ও বান্দা। আল্লাহ আগুন থেকে জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ জ্বীনদেরকে তাঁর আনুগত্য করার কিংবা অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষকেও তাঁর আনুগত্য করার কিংবা অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

আল্লাহ জ্বীন ও মানুষদেরকে তাঁর আনুগত্য করার পুরস্কার ও অবাধ্যতা করার শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ প্রথম মানুষ আদম عليه السلام ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া عليها السلام থেকে মানুষের বংশধারা চালু করেছেন। আল্লাহ নারী পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পুরুষকে নির্ভীকতা, সাহসিকতা কঠোরতার বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আল্লাহ নারীকে নম্রতা, মায়া-মমতা ও সৌন্দর্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আল্লাহ সকল মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর রিযিক এর ব্যবস্থা করে থাকেন। আল্লাহর সৃষ্ট নিয়ামতগুলো গণনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ কাউকে বেশি অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কাউকে কম অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ জীবকুলের মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান দান করেছেন। তবে জ্ঞানময় আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এই জ্ঞান খুবই সামান্য। আল্লাহ মানুষকে চিন্তাশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ মানুষকে দেখার শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ মানুষকে লেখার শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ মানুষকে বলার শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ মানুষকে শোনার শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ জোর করে তাঁর জীবন বিধান কোন জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেন না। এটা তাঁর ফিতরত (স্বভাব) বিরোধী। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যদি তারা তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারা পরিবর্তন না করে। এ হলো আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে ইসলামে কুরআন ও হাদীসের বাণী অনুযায়ী সার-সংক্ষেপ। আরও বিস্তারিত জানতে আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস পড়া যেতে পারে ।

সারকথা: উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝলাম যে সব ধর্মের মূল বক্তব্য হলো প্রত্যেক ধর্মই স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী: অর্থাৎ *"সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই"*। এবং তারই উপাসনা (ইবাদত) করা উচিত। অন্য কোন মূর্তি (প্রতিমা) মাজার,গাছ,সাপ,আগুন,কবর, পীর-পুরোহীত-পাদ্রী বা কোন মানুষের ইবাদত করা যাবে না এক সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করতে হবে। তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা যাবে না। এ বিষয়ে সকল ধর্মগ্রন্থগুলো একমত। আশা করি পাঠক একমত হবেন। এবার আসুন দেখি প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে ?

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমুহে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

এখন আমরা জানব প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে যে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে সে সম্পর্কে।১৬

১) সনাতন (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ
২) জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ
৩) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ
৪) ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ ও
৫) খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ

সনাতন (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ

সনাতন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যার মধ্যে অল্প কিছু এখানে উল্লেখ করছি মাত্র।

ভবিষ্যত পুরাণের তৃতীয় পর্ব তৃতীয় খন্ড ৫-৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে,"*একজন ম্লেচ্ছ মুসলিম আসবেন তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে মরুভূমি থেকে। তার নাম হবে মুহাম্মাদ ﷺ। রাজা ভোঝ এ দেবতুল্য মানুষকে স্নান (গোসল) করিয়ে পবিত্র করবেন। তাকে স্বাগত জানাবেন সম্মানের সাথে। তার সাথে কথা বলবেন শ্রদ্ধার সাথে। আর বলবেন, হে মানব জাতির গর্ব, আপনি শয়তানকে হারানোর জন্য এক বিশাল বাহিনী বানিয়েছেন।*" এখানে ম্লেচ্ছ এ সংস্কৃত শব্দটির অর্থ 'বিদেশী'। তিনি আসবেন তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে। এখানে সাহাবাদের কথা বলা হচ্ছে। আসবেন মরুস্থল থেকে। সংস্কৃত 'মরুস্থল' শব্দের অর্থ বালিময় স্থান বা মরুভূমি। তার নাম হবে "*মুহাম্মাদ*" ﷺ । রাজা ভোজ এ বিদেশীর সাথে কথা বলবেন শ্রদ্ধার সাথে আর বলবেন- "হে মানবজাতির গর্ব"। আপনারা জানেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তিনি

---

১৬ *মূল-- "বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ সা."* বই এর পৃ: ১৫ থেকে ৩২ এর সার সংক্ষেপ । লেখক- ডা: জাকির নায়েক- পিস পাবলিকেশন্স । আরও বিস্ড়ারিত জানতে ডা: জাকির নায়েকের লেকচার শুনুন ও বই পড়ুন। ভিডিও লেকচার "বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ সা." ইউটিউব লিংক-
https://youtu.be/oX2p-Bmv-gU?list=PLKUR8i0clNZ7X1G9KsBluOac5kgieGhx-
"বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ সা." বইয়ের ডাউনলোড লিংক নিচে
http://www.banglainternet.com/hadith/dr_jkr_nyk_bivinno_dhormo_gronthe_muhammad.pdf

www.QuranerAlo.com

গোটা মানব জাতির গর্ব। পবিত্র কুরআনের (৬৮) নং সূরা কালামের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- **"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"**

এছাড়াও পবিত্র কুরআনের (৩৩) নং সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- **"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর**[১৭] **মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ।"**

ভবিষ্যত পুরানে আরও বলছে যে, সেই লোক তার বাহিনী নিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমরা জানি আমাদের প্রিয় নবীজি এই কাজটাই করেছিলেন। এ ভবিষ্যত বাণীই স্পষ্ট প্রমাণ দেয় এখানে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা বলছে।

এরপর ভবিষ্যত পুরাণের তৃতীয় পর্ব তৃতীয় খন্ডের ১০-২৭ নং অনুচ্ছেদে আছে- *"ম্লেচ্ছদের বসবাসের স্থান নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে যে শত্রুরা আগে রাজত্ব করতো, সেখানে এসেছে আরো শক্তিশালী শত্রু। আমি একজন মানুষকে পাঠাবো যার নাম হবে মুহাম্মাদ ﷺ। মানুষকে পরিচালিত করবে সরল পথে। হে রাজা ভোজ, তুমি পিশাচদের রাজ্যে কখনোই যাবে না। কারন আমি আমার দয়া দিয়েই তোমাকে পবিত্র করবো। তারপর দেবতুল্য একজন মানুষ ভোজ রাজার কাছে আসল, তারপর বললো যে, আর্য ধর্ম এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা হবে ঈশ্বর (স্রষ্টা) পরমাত্মার আদেশে আমার অনুসারীদের খাৎনা দেয়া থাকবে। তাদের মাথার পিছনে কোন টিকি থাকবে না। তারা মুখে দাড়ি রাখবে। তারা একটি বিপ্লব করবে। তারা প্রার্থনার জন্য আহবান করবে। তারা সব হালাল খাবার খাবে। তারা বিভিন্ন পশুর গোশত খাবে, তবে এ লোকগুলো শূকরের মাংস খাবে না। তারা লতাপাতার মাধ্যমে নিজেদের পবিত্র করবে না; নিজেদের পবিত্র রাখবে যুদ্ধের মাধ্যমে। তাদের সম্প্রদায়কে বলা হবে মুসলিম (আত্মসমর্পনকারী)।"* এ ভবিষ্যতবাণী বলছে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা।

বলা আছে, "আমার অনুসারীদের খাৎনা দেয়া থাকবে"। আমরা সবাই জানি, মুসলিমরা খাৎনা করে। তাদের মাথার পিছনে টিকি থাকবে না, অনেকে এটাকে বলে শিন্ডি। তাদের "মুখে দাড়ি" থাকবে। তারা একটি বিপ্লব করবে। তারা প্রার্থনার জন্য আহবান করবে অর্থাৎ আযানের কথা বলা হচ্ছে। মুসলিমরা আযান দেয়। তারা সবাই হালাল খাবার খাবে, বিভিন্ন প্রাণীর গোশত খাবে তবে তারা শুকরের মাংস খাবে না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মোট চারবার বলেছেন।

যেমন -কুরআনের (২) নং সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে, (৫) নং সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা আছে- **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জন্তু, শূকরের মাংস, রক্ত এবং যে পশু আল্লাহর নাম ব্যতীত জবাই করা হয়েছে।"**

যেহেতু পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েকবার বলা হয়েছে যে, শূকরের মাংস খাওয়া হারাম (নিষিদ্ধ) ; তাই আমরা মুসমিরা শূকর খাই না।

ভবিষ্যৎবাণীতে আরো বলছে যে, তারা লতাপাতার মাধ্যমে পবিত্র হবে না, তারা পবিত্র হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। আর তাদের ডাকা হবে 'মুসলিম' বলে। এ ভবিষ্যৎ বাণী পরিষ্কারভাবেই মুসলিমদের ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বলছে।

---

[১৭] এখানে আল্লাহর রাসুল- মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অথর্ববেদের ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের

- **১ নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে**- *তিনি হলেন 'নরশাংসা' । তিনি 'কাওরাসা', যাকে রক্ষা করা হয়েছে ষাট হাজার নব্বইজন শত্রুর হাত থেকে।*
- **২ নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে**- *তিনি একজন উটে চড়া 'ঋষি'।*
- **৩ নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে**- তিনি হলেন মামাহ 'ঋষি'।
- **৪ নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে**- *তিনি হলেন 'বৈশবী বের'।*

১ নং মন্ত্র বলছে, তিনি হলেন 'নরশাংসা'। সংস্কৃত 'নর' এর অর্থ একজন মানুষ। 'শাংসা' মানে প্রশংসা বা প্রশংসনীয়। আর আরবি 'মুহাম্মাদ'- এর অর্থ ঠিক সেটাই। এটাই হলো সর্বশেষ ও চুড়ান্ত মহানবী ﷺ এর নাম। এর পরে বলা হচ্ছে, তিনি হলেন 'কাওরাসা'। 'কাওরাসা' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো 'অভিবাসী'। আমরা জানি নবী মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি অভিবাসী ছিলেন। এরপর বলা হচ্ছে, তাকে রক্ষা করা হয়েছে ষাট হাজার নব্বই জন শত্রুর কবল থেকে। আমরা জানি সে সময় মক্কায় যে সকল লোক নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে ছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার।

২ নং মন্ত্র বলছে- *'তিনি হবেন একজন উটে চড়া ঋষি'*। কোন ইন্ডিয়ান ঋষি বা ব্রাক্ষন কখনোই উটের পিঠে চড়বেন না। কারণ, উটে চড়া ব্রাক্ষনদের জন্য নিষিদ্ধ। মণুস্মৃতি ১১ অধ্যায়ের ২০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *"একজন ব্রাক্ষন কোন উট বা গাধার পিঠে চড়তে পারবেন না"*। সেজন্য ইনি হবেন এমন কেউ যিনি বিদেশী বা ইন্ডিয়ার অধিবাসি নন।

৩ নং মন্ত্র বলছে- ' তিনি হবেন মামাহ বা মহাঋৃষি। মামাহ, কেউ বলে থাকে মুহাম্মাদ কেউ বলে ঋষি।

৪ নং মন্ত্র বলছে, তিনি হলেন 'বের'। 'বের' অর্থ যিনি প্রশংসা করেন। মহানবী ﷺ এর আর একটা নাম 'আহমাদ'। আরবি 'আহমাদ' অর্থ যে প্রশংসা করে।

সূতরাং এ সকল মন্ত্রে স্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ ﷺ এর সম্পর্কে ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে। ভগবত পুরাণে ১২ নং খন্ডের ২নং অধ্যায়ের ১৮-২০ নং শেণ্টাকে বলা হয়েছে যে, *"বিঞ্জুয়াস নামে একজনের ঘরে যে মহত হৃদয়ের ব্রাক্ষণ , যে সাম্বলা নামে একটা গ্রামের প্রধান তার ঘরে জন্মাবে কলকি। তাকে ঈশ্বর (স্রষ্টা) উৎকৃষ্ট গুনাবলী দেবেন। আর ঈশ্বর (স্রষ্টা) তাকে দিবেন আটটি অলৌকিক শক্তি। তিনি চড়বেন একটা সাদা ঘোড়ায়। তার ডান হাতে থাকবে একটি তরবারি"*।

এরপর ভগবত পুরাণে ১ নং খন্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫ নং মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে-*"কলি যুগে যখন রাজারা হবে ডাকাতের মত, সে সময় "বিঞ্চুয়াসের ঘরে জন্ম নিবে কলি"* এছাড়াও পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪ নং মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে-" *বিঞ্চুয়াস নামে এক ব্যাক্তির ঘরে, যিনি মহত হৃদয় ব্রাক্ষণ, যিনি সাম্বালা গ্রামের প্রধান তার ঘরে জন্মাবে কলি"*। কলকি পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে- *"কলকিকে সাহায্য করবে চারজন সহচর। পাপীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।"* কলকি

পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে- *"কলকি অবতারকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবদুত বা ফেরেশতারা সাহায্য করবে"।*

কলকি পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের **১১** নং মন্ত্রে বলা হয়েছে- *"বিষ্ণুয়াস নামে এক ব্যক্তির ঘরে সুমতির গর্ভে জন্মাবে কলকি অবতার।"*

এক কথায় হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের এ কথাগুলো কলকি অবতার সম্পর্কে বলছে। আমি এবারে এই কথাগুলো সাজিয়ে আরো সংক্ষেপে বলছি। প্রথমত-তার বাবার নাম হবে 'বিঞ্ণুয়াস'। "বিঞ্ণু" মানে ঈশ্বর *(স্রষ্টা)* আর ইয়াস মানে ভৃত্য/দাস (বান্দা)। অর্থ্যাৎ ঈশ্বরের *(স্রষ্টার)* ভৃত্য/দাস (বান্দা)। এটার আরবি করলে হবে 'আব্দুল্লাহ' যার অর্থ-আল্লাহর বান্দা (দাস)। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ এর বাবা যার নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ'। তার মায়ের নাম হবে 'সুমতি'। 'সুমতি' এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ প্রশান্ত, প্রশান্তি, শান্তি। এটার আরবি করলে হবে 'আমিনাহ'। অর্থ্যাৎ মুহাম্মাদ ﷺ এর আম্মা যার নাম ছিল 'আমিনাহ'। বলা হয়েছে তিনি জন্ম নিবেন 'সাম্বালা' নামে একটি গ্রামে। 'সাম্বালা' মানে একটি প্রশান্ত এবং শান্তির জায়গা। আমরা জানি মক্কাকে 'দারুল আমান' বা শান্তির ঘর বলা হয়। নবিজী জন্ম নেন মক্কায়। এরপর বলা হয়েছে, তিনি সাম্বালার প্রধান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিবেন। আমরা জানি তিনি মক্কার প্রধান ব্যাক্তি আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে জন্মে ছিলেন । আরো বলা হয়েছে যে, তিনি হবেন শেষ ঋষি বা শেষ নবী।

আমরা জানি পবিত্র কুরআনের ৩৩ নং সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- **"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"** তাহলে কুরআন বলছে যে, নবীজি ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল।[১৮]

আরও বলা হয়েছে, কলকি অবতার চড়বেন একটি সাদা ঘোড়ায়। আমরা জানি নবীজি ﷺ বোরাকে চড়েছিলেন যখন তিনি মিরাজে যান। আরও বলা হয়েছে তার হাতে থাকবে একটি তরবারি। আমরা জানি মুহাম্মাদ ﷺ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার ডানহাতে একটি তরবারি থাকত। এরপর বলা হয়েছে যে, তার সাহায্য করবে 'চারজন সহচর'। এখানে চারজন প্রধান সাহাবীর কথা বলে হচ্ছে অর্থ্যাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন, আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী رضي الله عنهم এর কথা। এরপর বলা হয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে দেবদূত বা ফেরেশতারা সাহায্য করবে।

পবিত্র কুরআনের ৮ নং সূরা আনফালের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে **"স্মরণ কর সেই সংকট মুহুর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।"**

এই আয়াত থেকে জানা যায় ফেরেশতারা নবীজি কে সাহায্য করেছিল সেটা ছিল বদরের যুদ্ধে। আর মুসলিমরা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে ।

---

১৮ মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী; তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না-এ বিষয়টি আল-কুরআনের এই আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

www.QuranerAlo.com

সূতরাং হিন্দু (সনাতন) ধর্মে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে। এ বিষয়ে যদি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একমত না হন তাহলে উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণী কার সম্পর্কে করা হয়েছে? সে প্রশ্ন থেকেই গেল তাদের কাছে।

জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ

এবার দেখা যাক জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। জরথুষ্ট্র হলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এটাকে পারসিইজমও বলা হয়। এটার উৎপত্তি হয়েছে পারসিয়াতে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। এ পারসিইজমকে আরো বলা হয় মেগিয়ানিজম অথবা যে ধর্মের অনুসারীরা অগ্নি পূজা করে। আপনারা যদি এই পারসি ধর্মগ্রন্থ পড়েন, অনেক জায়গাতেই দেখবেন নবীজি মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা বলা হয়েছে।

জেন্দা আভেস্তার নফারভাস্তি ইয়াস্তের ২৮ নং অধ্যায়ের ১২৯ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- "*তার নাম হবে জয়জুক্ত, তার নাম হবে আস্তাবেদ আরেতা। তার আরেকটা নাম হবে <u>সোশিম</u> বলা হয়েছে যে তাকে ডাকা হবে 'সোশিম'। তার নাম হবে আস্তাবেদ আরেতা।*" আমরা জানি নবিজী ﷺ যুদ্ধ জিতেছিলেন, অনেক যুদ্ধে জিতেছিলেন, তাই তিনি 'আস্তাবেদ আরেতা' অর্থ্যাৎ 'জয়যুক্ত'। ইতিহাসের বিশ্ব কোষের কথা অনুযায়ী 'সোশিয়েনথ' অর্থ 'যে লোক প্রশংসার যোগ্য' বা 'যে প্রশংসা করেছে'। যার আরবি করলে হবে 'মুহাম্মাদ' ﷺ। তাহলে পারসি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও মুহাম্মাদ ﷺ এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

নবীজি ﷺ এর আরেকটা নাম 'আহমাদ'। 'আহমাদ' শব্দের অর্থ যে প্রশংসা করে। জেন্দ আবেস্তার জামিয়াধ ইয়াস্তের ১৬ অধ্যায়ের ৯৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "*তার বন্ধুরা চলে আসবে। অর্থাৎ আস্তবেদ আরেতার বন্ধুরা। তারা সেখানে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারা চিন্তা ভাবনা করবে, ভাল কথা বলবে, ভাল কাজ করবে আর তাদের জিহবা কোন মিথ্যা উচ্চারণ করবে না।*"

এখানে সাহাবীদের কথা বলা হচ্ছে অর্থ্যাৎ নবীজির সহচরেরা তারা ভাল মানুষ হবে। চিন্তা করে কাজ করবে, ভাল কথা বলবে, তারা সবাই ভাল কাজ করবে তাদের জিহবা মিথ্যা উচ্চারণ করে না অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা বলে না। আমরা জানি সাহাবিগণ সত্য কথাই বলতেন।

বুন্দাহিসোর ৩০ নং অধ্যায়ের ৬-২৭ নং অনুচ্ছেদে আছে যে, "*সোশিয়েন হবেন শেষ নবী।*" "সোশিয়েন" এটার অর্থ হলো প্রশংসনীয় অর্থ্যাৎ মুহাম্মাদ ﷺ। আর এখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মাদ ﷺ হবেন শেষ নবী। এই হলো সংক্ষেপে জরথুস্ত্রীয় (পারসি) ধর্মগ্রন্থগুলোতে আমাদের নবীজি মুহাম্মাদ ﷺ এর বর্ণনা। এবার আসুন দেখি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে ?

www.QuranerAlo.com

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ

প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই আছে যে, ভবিষ্যতে একজন 'মাইত্রি' আসবেন । চিক্কভতি সিনহনাদ সুতানতার ডি-১১১৭৬ এ বলা আছে- *"আরেকজন বুদ্ধ আসবেন, তিনি মাইত্রি। যিনি পবিত্র ,সবার উপরে, যিনি আলোকপ্রাপ্ত । যিনি খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী। যিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। যিনি অলৌকিকভাবে যে জ্ঞান আহরণ করবেন তা পুরো পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা ধর্ম প্রচার করবেন, যেটা শুরুতে গৌরবময় থাকবে চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে আর শেষেও গৌরবময় থাকবে। তিনি একটা জীবন-দর্শন প্রচার করবেন। যেটা হবে সত্য এবং পুরোপুরি সঠিক। তার সাথে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী থাকবে। যেখানে আমার সাথে কয়েকশ সন্ন্যাসী থাকে।"* এ কথা আরও বলা হয়েছে Sacred Book of the East এর ৩৫ নং খন্ডের ২২৫ নং পৃষ্ঠায় *"একজন মাইত্রি আসবেন যার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর গুন থাকবে।"* এরপরে বলা হয়েছে, *"তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দেবেন যেখানে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি কয়েকশ মানুষকে।"* গসপেল অব বুদ্ধ- এর ২১৭ ও ২১৮ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে যে -*"আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন যে, হে আশির্বাদ প্রাপ্ত, আপনি যখন চলে যাবেন কে আমাদের পথ দেখাবে? তখন গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বললেন- আমি পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধ নই। এমনকি শেষ বুদ্ধও নই। ভবিষ্যতে আরেকজন বুদ্ধ পৃথিবীতে আসবেন, যিনি পবিত্র, সবার উপরে, যিনি আলোকপ্রাপ্ত, যিনি খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী। যিনি মঙ্গলনক, যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি প্রচার করবেন একটি ভালো ধর্ম। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে আর শেষেও গৌরবময় থাকবে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি হবে সত্য আর সেটাই হবে সঠিক জীবন দর্শন। আর তার থাকবে হাজার হাজার শিষ্য যেখানে আমার আছে মাত্র কয়েকশ শিষ্য। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করলেন- আমরা তাকে কিভাবে চিনব? বুদ্ধ উত্তর দিলেন, সে লোকের নাম হবে 'মাইত্রি'।"* মাইত্রি অর্থ ক্ষমাশীল, স্নেহময়, দয়ালু, করুণাময়। এ শব্দটার আরবি করলে হবে 'রাহমা'। পবিত্র কুরআনের (২১) নং সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে- **"আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য <u>রহমত</u> হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"**

এই 'রাহমা' শব্দ এর সমার্থক শব্দ 'ক্ষমা '। তাহলে বৌদ্ধ ধর্মে 'মাইত্রি' নামে যে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

গসপেল অব বুদ্ধ-এর ২১৪ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে, *"এ যে মাইত্রি আসবেন, তার ছয়টা গুণ থাকবে। তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলা, আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি উজ্জ্বল হবেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন, তিনি রাতের বেলা মারা যাবেন, মারা যাবার সময় তিনি উজ্জ্বল হবেন, মারা যাওয়ার পর এ পৃথিবীতে তাকে আর কখনো স্বশরীরে দেখা যাবে না।"* এ ছয়টা গুণ মহানবী ﷺ এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

আমরা জানি নবীজি প্রথম ওহী রাতের বেলাই লাভ করেন। কুরআনের (৪৪) নং সুরা আদ-দুখানের ২-৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে **"সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, (কেননা) আমি (মানুষকে)**

সতর্ককারী।" এবং (৯৭) নং সূরা ক্বদরের **১**নং আয়াতে আছে- **"নিশ্চয়ই আমি ইহা** (কুরআন) **অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে"**

এরপর আছে তিনি উজ্জল হবেন। আমরা জানি যে আমাদের নবীজি তখন উজ্জল হয়েছিলেন, আলোকিত হয়েছিলেন। এরপর আছে তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন। আমরা জানি তিনি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছেন। চতুর্থত তিনি মারা যাবেন রাতের বেলা। আর আয়েশা ﵂ এর হাদিস থেকে আমরা জানি যে, নবীজির ঘরে প্রদীপে তেল ছিল না; তিনি পাশের বাড়ি থেকে তেল ধার নিলেন । অর্থাৎ নবীজি মারা যাবার সময় তখন রাত ছিল। এরপর আছে তিনি মারা যাওয়ার সময় উজ্জল হবেন। আনাস ﵁ বলেছেন যে, নবীজি মারা যাবার সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন। এরপর হলো মারা যাবার পর তাকে আর কখনো স্বশরীরে দেখা যাবে না। আমরাও জানি যে, তিনি আর ফিরে আসবেন না। মদিনায় তার কবর রয়েছে। তাকে স্বশরীরে আর দেখা যাবে না। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উল্লেখ করা এ কথাগুলো শুধুমাত্র নবীজী মুহাম্মাদ ﷺ এর বেলাই খাটে। আর কারও সাথে মিলে না। আসুন এবার দেখি ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ

খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল'। বাইবেলের দুটি খন্ড একটা ওল্ড টেস্টামেন্ট আর একটা নিউ টেস্টামেন্ট।[১৯] আমরা প্রথমে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে নবীজির ﷺ এর বর্ননা নিয়ে কথা বলব।

ওল্ড টেস্টামেন্টের Book of Deuteronomy- এর ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে- মহান ঈশ্বর (স্রষ্টা) বলেছেন, *"আমি একজন নবীকে পাঠাবো, তোমার মত করে তোমার ভাইদের মধ্য থেকে। আমি তাকে ধর্ম প্রচার করতে বলবো। সে আমার আদেশে সব কথা বলবে।"*

এখানে বলা হয়েছে, আমি একজন নবী পাঠাবো তোমার ভাইদের মধ্য থেকে যে তোমার মত হবে। অর্থ্যাৎ মূসা عليه السلام এর-মত হবে। আর খ্রিষ্টানরা বলে যে এ কথাগুলো বলা হচ্ছে ---যিশু খ্রিষ্ট বা ঈসা عليه السلام সম্পর্কে।

তাদেরকে যদি বলি যে, এটা কিভাবে ঈসা عليه السلام সম্পর্কে বলা হয়েছে ? তারা তখন বলে যে, যে নবী আসবেন তিনি মূসা عليه السلام এর মত হবেন আর ঈসা عليه السلام ছিলেন মূসা عليه السلام এর মতই। তারপর যদি প্রশ্ন করি তাদের মাঝে মিলটা কোথায়? তারা তখন বলে যে, মূসা ও ঈসা عليه السلام তারা দুজনেই আল্লাহর নবী ছিলেন। আর তারা দুজনেই ইহুদি। সেজন্য এখানে (যিশু) ঈসা عليه السلام সম্পর্কেই বলা হয়েছে এটা তারা দাবি করে। এই দুটি ব্যাপার মিলে গেলেই যদি দাবি করা হয় যে, তিনি নবী ছিলেন আর ইয়াহুদি ছিলেন, তাহলে বাইবেলে যতজন নবীর কথা আছে মূসা عليه السلام এর পরে সবার ক্ষেত্রেই এটা খাটে। যেমন ধরেন--সোলায়মান, ইজিফিয়েল, আইজেক, আইজিয়া, দানিয়েল, হোসিয়া, জোয়েল। তাদের সবার ক্ষেত্রেই এটা খাটে।

যদি ভাল করে দেখেন তাহলে দেখা যাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী সবচেয়ে বেশি মিলে যায় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে। আসুন দেখি ভবিষ্যৎবাণীতে কি বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, আমি একজন নবী পাঠাবো তোমার ভাইদের মধ্য থেকে যে তোমার মত হবে অর্থ্যাৎ মূসা عليه السلام এর মত। যদি ভালো করে দেখেন তাহলে দেখবেন, মূসা عليه السلام আর মুহাম্মাদ ﷺ তারা দুজনেই জন্মেছিলেন স্বাভাবিকভাবে। তবে যিশু বা ঈসা عليه السلام তিনি স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেননি, তিনি কোন পুরুষের ওরসজাত হয়ে জন্মগ্রহন করেন নি। পবিত্র কুরআনের (৩) নং সূরা ইমরানের ৪৫-৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সে সম্পর্কে বলেছেন-"(স্মরণ কর) **যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম**

১৯ অনলাইনে বাইবেলের নিউ-টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন অনুবাদ দেখতে এই লিংকগুলো ভিজিট করুন।
১. হিব্রু ভাষা মূল: https://www.wordproject.org/bibles/he/index.htm
২. ইংরেজী অনুবাদ: https://www.wordproject.org/bibles/kj/index.htm
৩. বাংলা অনুবাদ: https://www.wordproject.org/bibles/ben/index.htm

www.QuranerAlo.com

মারইয়ামের পুত্র ঈসা-মসীহ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত ও সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' সে লোকেদের সাথে দোলনা থাকা অবস্থায় এবং বয়োঃপ্রাপ্ত অবস্থায় কথা বলবে এবং নেক বান্দাদের অন্তর্গত হবে। মারইয়াম বলল, হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন পুরুষ মানুষতো আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি বললেনঃ এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে থাকেন, যখন তিনি কোন কাজের মনস্থ করেন তখন তিনি ওকে 'হও' বলেন, ফলে তা হয়ে যায়। "

এছাড়াও বাইবেলের গসপেল অফ ম্যাথিউর ১ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এছাড়াও গসপেল অব লুক ১ নং অধ্যায়ের ৩৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, *"তিনি কোন পুরুষের ওরসজাত হয়ে জন্মাননি, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছেন"।* এভাবে মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মূসা عليه السلام এর মত। কিন্তু ঈসা عليه السلام মূসা عليه السلام এর মত ছিলেন না। এরপর আরো দেখবেন, মূসা عليه السلام এবং মুহাম্মাদ ﷺ দুজনেই বিবাহিত ছিলেন। তাদের সন্তান ছিল। কিন্তু বাইবেলের কথা অনুযায়ী ঈসা عليه السلام অবিবাহিত ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না। তাহলে (যিশু) ঈসা عليه السلام মূসার মত ছিলেন না। বরং মুহাম্মাদ ﷺ মূসা عليه السلام এর মত ছিলেন।

মূসা عليه السلام এবং মুহাম্মাদ ﷺ তারা দুজনেই স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন কিন্তু (যিশু) ঈসা عليه السلام স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি। পবিত্র কুরআনের (৪) নং সূরা নিসার ১৫৭-১৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন **"আর 'আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ ঈসা ইবনু মারইয়ামকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। কিন্তু তারা না তাকে হত্যা করেছে, না তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে, কেবলমাত্র তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল, আর যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তারাও এ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছিল। শুধু অমূলক ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"**

আমরা জানি (যিশু) ঈসা عليه السلام মারা যাননি। আল্লাহ (যিশু) ঈসা عليه السلام কে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন । আর (যিশু) ঈসা عليه السلام শেষ জমানায় পৃথিবীতে আবার আসবেন। আসমান থেকে তিনি দুই ফেরেশতার কাধে ভর করে নেমে আসবেন পৃথিবীতে ।

আমরা যদি সঠিকভাবে বাইবেল পড়ি, বাইবেলও বলছে তিনি মারা যাননি কিন্তু খ্রিস্টানরা মনে করে যে (যিশু) ঈসা عليه السلام ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তবে তর্কের খাতিরে এই কথা মেনে নিলেও বলতে হবে যে, (যিশু) ঈসা عليه السلام স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি।

খ্রিষ্টানরা যেভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করে সেটা ভুল। তারপরও সেটা মানলে এটা জানবেন যে যিশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি বরং তাকে জীবন্ত আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাহলে দেখা গেল ঈসা عليه السلام মূসা عليه السلام এর মত নয় বরং মুহাম্মাদ ﷺ মূসা عليه السلام এর মত।

মূসা ﷺ এবং মুহাম্মাদ ﷺ দুজনেই নতুন আইন এনেছেন। তবে বাইবেলের কথা অনুযায়ী যিশু বা ঈসা ﷺ নতুন কোন আইন আনেননি। বাইবেলের গসপেল অব ম্যাথিউ ৫ নং অধ্যায়ের ১৭-১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- *"ভেবনা যে আমি নবীদের আইন ধ্বংস করতে এসেছি আমি ধ্বংস করতে আসিনি, পূর্ণ করতে এসেছি ।"*

অর্থাৎ মূসা ﷺ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নবী থাকার পাশাপাশি পৃথিবীতে শাসক হিসেবে ছিলেন অর্থাৎ কেউ অপরাধ করলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার ক্ষমতা রাখতেন। তবে (যিশু) ঈসা ﷺ এর এ ক্ষমতা ছিল না। গসপেল অব জন এর ১৮ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যিশু তার নিজের মুখে বলেছেন *"আমার রাজত্ব এ পৃথিবীতে নয়"।* গসপেল অব জনের ১ নং অধ্যায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- *"সবাই তাকে ত্যাগ করেছিল।"* তাহলে ভাল করে দেখলে আপনারাও বুঝবেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন মূসা ﷺ এর মত। কিন্তু ঈসা ﷺ এর মত নন। তাহলে এই ভবিষ্যৎ বাণীটা আসলে নবীজি ﷺ সম্পর্কে বলছে।

তাই এ সকল ভবিষ্যৎবাণীতে আসলে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে। (Book of Deeuteronomy)- "দ্বিতীয় বিবরন" এর ১৮ নং অধ্যায়ের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-*"তোমরা যদি তার কথা না মান তাহলে আমি তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিবো ' ।*

তার মানে যারা এ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা মানবে না, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিশোধ নিবেন। বুক অব ঈসাইয়া এর ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- *"আসমানী কিতাব দেয়া হবে তাকে যে শিক্ষিত নয়। কিতাব দেয়া হবে সেই নবীকে যে শিক্ষিত নয়। তাকে যখন বলা হবে এটা পড়ো , সে তখন বলবে আমি পড়তে জানি না।"* আর আমরা জানি নবীজি ﷺ এর কাছে যখন ওহী আসল, জিবরাঈল ﷺ তাকে বললেন, ইক্বরা-'পড়ো' নবীজি ﷺ বললেন, আমি পড়তে জানি না। যেমন- কুরআনে বর্ণিত রয়েছে **"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"** [সূরা আ'লাক- ৯৬: ১] এভাবে উক্ত বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণীটি সত্যি হলো যে, আসমানী কিতাবে যে নবীকে দেয়া হলো, তিনি হলে অশিক্ষিত (নিরক্ষর)। আমরা জানি যে নবী মুহাম্মাদ ﷺ নিরক্ষর ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মী। আর যখন তাকে বলা হবে 'পড়ো' তিনি তখন বলবেন আমি পড়তে জানি না । আর নবীজি সেটাই বলেছিলেন।

এছাড়াও ওল্ড টেস্টামেন্টে নবীজি ﷺ এর কথা নাম ধরেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বলা হয়েছে Song of Solomon এর ৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে যে,*"তার অর্থ খুব মিষ্টি, সে খুব প্রিয়পাত্র , সে আমার প্রিয়জন, সে আমার বন্ধু , শোন জেরুজালেমের কন্যারা"।* হিব্রুতে 'মুহাম্মাদিন' শব্দটার অনুবাদ করা হয়েছে যে '*খুব প্রিয়পাত্র*'। তবে সেমেটিক ভাষায় আরবি বা হিব্রুতে 'হুম' দিয়ে সম্মান বুঝানো হয়।

তাহলে ওল্ড টেস্টামেন্টে নবীজি ﷺ এর নাম ধরেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখন যদি পড়েন, দেখবেন 'মুহাম্মাদিন' এর অনুবাদ করা হয়েছে 'খুব প্রিয় পাত্র'।

www.QuranerAlo.com

এবার দেখা যাক নিউটেষ্টামেন্টে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। এখন যদি আমি খ্রিষ্টানদের কথা বলি, ওল্ড টেস্টামেন্টে যা বলা আছে সেটা তারা মানবে কারণ এটা তাদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেলেরই' একটি অংশ। পবিত্র কুরআনের (৭) নং সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- **"যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায় "**

কুরআনের (৬১) নং সূরা সফ এর ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-**"স্মরণ কর, যখন মারইয়ামের পুত্র 'ঈসা বলেছিল, 'হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং <u>আমি একজন রসূলের সুসংবাদদাতা</u> যিনি আমার পরে আসবেন, <u>যার নাম 'আহমাদ।'</u> অতঃপর সে** [অর্থাৎ 'ঈসা عليه السلام মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন] **যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'এটা তো স্পষ্ট যাদু।"**

নিউ টেস্টামেন্ট পড়লে দেখা যাবে সেখানে নবী ﷺ সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। গসপেল অব জন ১৪ নং অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট বলেছেন- *"আমি প্রভূর কাছে প্রার্থণা করব তিনি সাহায্যকারী পাঠাবেন"* গসপেল অব জন এর ১৬ নং অধ্যায়ের ১৪-১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে- যিশু বা ঈসা عليه السلام বলেছেন- *"যখন সেই সাহায্যকারী আসবে, আমার ঈশ্বর (স্রষ্টা) যাকে পাঠাবেন সে আমার সম্মান বাড়িয়ে দিবে।"* এরপর গসপেল অব জন- এর ১৬ নং অধ্যায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-*"আমি তোমাদের সত্যি কথাটাই বলে ফেলি। আমি চলে গেলেই তোমাদের সবার জন্য ভাল হবে। কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী আসবে না আর আমি গেলেই সে এখানে আসবে"*। খ্রিষ্টানরা এ সাহায্যকারী বলতে 'পবিত্র আত্মাকে' বুঝায়।

এখন এ ভবিষ্যৎ বাণীটা যদি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন, এখানে বলা হচ্ছে *<u>"আমি চলে গেলেই একজন সাহায্যকারী আসবেন"</u>*। সাহায্যকারী আসার শর্তই হলো আমি চলে যাওয়া। তিনি চলে গেলেই তারপর সাহায্যকারী এখানে আসবেন। আমরা জানি 'পবিত্র আত্মা' তখনো ছিল, যিশুকে যখন 'ব্যাপ্টাইজ' করা হয়। এমনকি যিশুখ্রিষ্ট জন্মের পূর্বেও 'পবিত্র আত্মা' সেখানে ছিল। যখন তিনি মায়ের গর্ভে ছিলেন। তাহলে সাহায্যকারী আসলে 'পবিত্র আত্মা' হতে পারে না। তারপর এ সাহায্যকারী শব্দটা যদি গ্রিক বা এ্যারোমিক ভাষাতে দেখেন, তাহলে দেখবেন- গ্রিক ভাষায় এ শব্দটা আসলে সমর্থন করা। মূল শব্দটা হলো 'পেরাক্লিটস'। যার অর্থ যে প্রশংসা করে অথবা যে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমরা জানি যে, নবীজির দুটো নাম হচ্ছে *"আহমদ"* আর *"মুহাম্মাদ"*। শব্দটা যাই ধরেন, হোক সমর্থন বা সাহায্যকারী কিংবা প্রশংসনীয় বা প্রশংসারযোগ্য এ কথাগুলো সবচেয়ে বেশি মিলে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর বেলায়।

গসপেল অব জনের ১৬ নং অধ্যায়ের ১২-১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- “যিশু (ঈসা عليه السلام)বলেছেন- *“তোমাদের আমি অনেক কথাই বলতে চাই, কিন্তু তোমরা এখন সেগুলো বুঝবে না। কারণ সত্যের আত্মা যখন তোমাদের কাছে আসবে সে তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথাগুলো বলবে না, যে কথাগুলো শুনবে সেগুলোই বলবে। সে আমাকে মহিমান্বিত করবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে”।* এখানে বলা হয়েছে আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু এখন তোমরা সেটা বুঝবে না। সত্যের আত্মা যখন আসবে সে তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে নিজের কথা বলবে না। সে যা শুনবে তাই বলবে। এখানে মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আর আমরা জানি নবী করিম ﷺ এর ওপর ওহী এসেছিল, তিনিই ওহীর মাধ্যমে যা শুনতেন, তিনি সেটাই বলেছিলেন। সে তার নিজের কথা বলবে না, যে কথা শুনবে সেগুলোই বলবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে। হ্যাঁ, নবীজি ﷺ অনেক ভবিষ্যতবাণী করেছেন যা এখন বর্তমানে মিলে যাচ্ছে। সে আমাকে মহিমান্বিত করবে। আমরা জানি মুহাম্মাদ ﷺ ঈসা (যিশু) عليه السلام কে মহিমান্বিত করেছেন পবিত্র কুরআন আর হাদীসে। আমরা জানি (যিশু) ঈসা عليه السلام মাসীহ। আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। বিশ্বাস করি তিনি আল্লাহর আদেশে মৃত মানুষকে জীবিত করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আল্লাহর আদেশে জন্মান্ধ কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করেছিলেন। তাহলে নবী মুহাম্মাদ ﷺ (যিশু) ঈসা عليه السلام কে মহিমান্বিত করেছেন। এই হলো ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে মহানবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা।

সূতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ যেমন- সনাতন (হিন্দু) ধর্ম, ফরাসি, ইয়াহুদি খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে থেকে দেখতে পেলাম যে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং তার আনীত ধর্মের (দ্বীনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন ও তাকে মান্য করার কথা বলা হয়েছে। তাই অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যদি তাদের ধর্মগ্রন্থ মেনে থাকে তাদের উচিত ইসলাম গ্রহন করা যেহেতু তাদের ধর্মগ্রন্থেই বলছে ইসলাম গ্রহণ করতে।

সারকথা: উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানলাম যে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ধর্ম গ্রন্থেই মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমনের ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে, তার আনিত (ধর্ম) দ্বীন ইসলামকে মেনে নিতে বলা হয়েছে, তাই অমুসলিমদের উচিত মুহাম্মাদ ﷺ কে নবী হিসেবে মেনে নেওয়া ও ইসলাম গ্রহণ (কবুল) করা। যেহেতু তাদের ধর্মগ্রন্থ গুলোই তা বলছে। এখানে আমি শুধু আমাদের মুসলিমদের কুরআন ও হাদিস থেকেই বলিনি বরং অমুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ থেকে দলিলসহ (রেফারেন্সসহ) বলেছি।

তাই আমি বলব অমুসলিমদের উচিত আমার দেওয়া দলিলগুলো তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে যাচাই করা, যে আমি ঠিক বলছি না ভূল বলছি। যদি তারা সঠিক পায় তাহলে তাদের উচিত, সঠিক ধর্মই গ্রহণ করা অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা।

সব ধর্মই ভাল কথা বলে তবে কেন ইসলাম ?

হ্যাঁ-সকল ধর্মই মুলত তার অনুসারীদেরকে ভালো ভালো কাজ করতে শিক্ষা দেয়। তা হলে শুধু ইসলামকে মানতে বলা হচ্ছে কেন ?

জবাবঃ

ক. অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্যঃ মুলত প্রতিটি ধর্মই মানুষকে মন্দ দূর করতে ও ভাল হবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ইসলামের পরিধি আরো ব্যাপক। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায়-পরায়নতা অর্জনের বাস্তবসম্মত পথ ও পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে যাবতীয় মন্দ নির্মূল করা যায়।

খ. যেমন ইসলাম আমাদেরকে চুরি, ডাকাতি পরিহার করতে বলার সাথে সাথে সে এও বলে দেয় যে, কেমন করে সমাজ থেকে এ প্রবনতা নির্মূল করা যাবে।

১) বড় বড় সব ধর্মই শিক্ষা দেয় চুরি ডাকাতি মন্দ কাজ ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্যটা হলো চুরি ডাকাতি মন্দ কাজ এ শিক্ষার সাথে সাথে ইসলাম এমন একটি সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের বাস্তব পদ্ধতি নির্দেশ করে যে সমাজে চুরি ডাকাতির প্রয়োজনই পড়বে না।

২) **চুরির শাস্তি হাত কেটে ফেলাঃ** চোর প্রমাণিত হলে তার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছে ইসলাম।[২০] এটা এ জন্য যে এই হাতকাটার বিধান থাকলে চোর আর সাহস করবে না চুরি করার। বিজ্ঞানময় কুরআন বলছে ঃ **"আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।"** [সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৩৮]

৩) ইসলামী বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তার কল্যানী ফলাফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। আমেরিকা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে উন্নততম। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে চুরি,ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে তার আছে সর্বোচ্চ রেকর্ড। এই আমেরিকায় যদি ইসলামের পূর্নাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় একদিকে প্রতিটি সার্মথ্যবান ব্যক্তি রীতিমতো যাকাত আদায় করছে অপরদিকে নারী বা পুরুষ চোর প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হাত কেটে

২০ [বি দ্রঃ অভাবের তাড়নায় কেউ খাদ্যদ্রব্য বা খাবার নিজের ক্ষুধা মেটাতে চুরি করলে তার হাত কাটা হয় না ।]

www.QuranerAlo.com

ফেলা। তাহলে আমেরিকায় চুরি, ডাকাতির বর্তমান প্রবণতা বাড়বে, না একই রকম থাকবে, নাকি একেবারে কমে যাবে? সঙ্গত ভাবেই তা কমে যাবে। তদুপরি এই ধরনের কঠিন আইন থাকলে অনেক স্বভাবের চোরও নিজেকে এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ চুরি ডাকাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একথা মানতেই হবে যে, পৃথিবী ব্যাপী চুরি ডাকাতির বর্তমান যে হার তাতে হাত কাটা আইন চালু হলে লক্ষ লক্ষ লোক এমন দেখা যাবে যাদের হাত কাটা। বিষয়টা হলো যে মুহূর্তে এই আইন ঘোষনা করা হবে তার পরের মুহূর্ত থেকেই এ প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমে আসতে থাকবে। পেশাদার চোরও এ পথে পা ফেলার আগে একবার ভেবে নেবে ধরা পড়লে তার পরিনতি কি হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই চোরের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। তখন নিতান্ত দুরাত্মা ও দুর্ভাগা ছাড়া এ কাজ আর কেউ করবেনা সামান্য কয়েকটি লোকের হয়তো হাত কাটা যাবে কিন্তু কোটি কোটি মানুষ লাভ করবে নিরাপত্তা, শান্তি এবং সর্বস্ব হারাবার ভয় থেকে মুক্তি। ইসলামী বিধান এই রকম বাস্তবধর্মী এবং প্রত্যক্ষভাবে ফলদায়ক। কারন এটা মহান স্রষ্টার বিধান।

৪) মানুষের অভাব দুর করতে ইসলাম যাকাতের বিধান দিয়েছে। ইসলাম বিধান দিয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য যাকাত বাধ্যতামূলক যার নিসাব পরিমান সম্পদ উদ্ধৃত্ত থাকে। অর্থাৎ বাৎসরিক আয় ব্যয়ের পরে ৮৫ গ্রাম সোনা বা এর সম মূল্যের নগদ অর্থ অথবা অন্যান্য মাল পত্র উদ্ধৃত্ত থাকবে তার ২.৫% বা শতকারা আড়াই টাকা প্রতি চন্দ্র বৎসরের শেষে তাকে (৮ শ্রেণির অভাবগ্রস্থ লোকদের দিয়ে দিতে হবে)। পৃথিবীর প্রতিটি সম্পদশালী ব্যক্তি যদি সত্যি সত্যিই এই যাকাত আদায় করে তাহলে দারিদ্রতা বলতে পৃথিবীতে কিছু থাকবে না। তখন ভিক্ষা দিতেও একজন ভিখারীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। (এই হলো ইসলামী অর্থনীতির মাত্র একটি কার্যক্রম। শুধুমাত্র এই যাকাত ব্যবস্থাটুকু কার্যকর হলে হাত-পাতার লোক খুঁজতে হবে।)

গ. মানবীয় সমস্যায় ইসলামের সমাধান:

বাস্তব মুখী ইসলাম মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনযাপন পদ্ধতি। কেননা এর শিক্ষা অকার্যকর নয় বরং মানুষের যাবতীয় সমস্যার নগদ ও বাস্তব সমাধান। স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও সামাজিক সমস্যা, উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামে প্রত্যক্ষ ফলাফল অর্জন করে। ইসলাম একারণেও শ্রেষ্ঠতম জীবনপদ্ধতি যে, এটা বাস্তব সম্মত বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। কোনো জাতি অথবা জাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।[২১]

---

২১ সূত্র: " ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব" পর্ব ২ লেখকঃ ডাঃ জাকির নায়েক। ডাউনলোড লিংক ।
http://www.quraneralo.com/answers-to-20-confusing-questions-of-non-muslims-2/

www.QuranerAlo.com

আপনি কেন কাফির (অবিশ্বাসী) অথবা মুসলিম?

এটা কেমন প্রশ্ন হলো? অনেকে হয়ত এরকমটাই বলবেন! অথচ আপনাকে যদি এই প্রশ্নটা কেউ করে, কি উত্তর দিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে হয়ত বলবেন। আমার বাপ-দাদা কাফির (অবিশ্বাসী) ছিলেন। তাই আমিও অবিশ্বাসী।

আবার মুসলিমদেরকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনি কেন মুসলিম ? অন্য ধর্মেরওতো অনুসারী হতে পারতেন ? সেও হয়ত ঐ একই উত্তর দিবে বংশগতভাবে (জন্মগতভাবে) আমার বাপ-দাদা মুসলিম ছিলেন, তাই আমিও মুসলিম। কিন্তু এটা যথাযথ উত্তর নয়। আচ্ছা- ভাই তাহলে বংশগতভাবে (জন্মগতভাবে) আপনার বাপ-দাদা যদি হিন্দু হতেন তাহলে কি আপনি হিন্দু হতেন ? সে তখন বলবে হয়ত-হতাম। আসলে এই উত্তরটা যথাযথ নয়। কেননা আপনি একজন মানুষ। আপনার আছে বিবেক জ্ঞান-বুদ্ধি চিন্তা-উপলব্ধি এবং যাচাই করার ক্ষমতা যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। আপনি জানার চেষ্টা করবেন ও যাচাই করে দেখবেন কোন ধর্ম সঠিক তারপর সেটা গ্রহণ করবেন। কিন্তু না জেনে আপনি কোন ধর্মের অন্ধ অনুসরণ করতে পারেন না। এটা স্ব-বিবেকবিরোধী । আপনাকে জানার চেষ্টা করতে হবে। তাই মুসলিম ব্যক্তির এই প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত, যে আমি আল-কুরআন ও হাদীছ, ইসলামি বই পড়ে জেনেছি, যথাযথ জ্ঞান অর্জন করেছি,সত্যকে তালাশ করেছি এবং যাচাই করে দেখেছি আসলে ইসলামই সৃষ্টিকর্তার সঠিক ধর্ম আর তাই আমি মুসলিম হয়েছি, এক্ষেত্রে আমার বাপ-দাদা কোন ধর্মের অনুসারী ছিল তাতে কিছু যায় আসে না। বাপ-দাদারা যদি ভুল করে থাকেন তাহলে আমরা কি জেনে শুনে ভুল করব ? অবশ্যই না, হতেই পারে না। তাই কোন ধর্ম (দ্বীন) মানার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালভাবে পড়াশোনা করে জেনে শুনে যাচাই করে পালন করা উচিত। নতুবা আপনি এমন কোন ধর্ম পালন করলেন যা ভুল ও অসম্পূর্ণ এবং যা সৃষ্টিকর্তার বাণী নয়। তাহলে পরকালে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। আপনাকে পরকালে জাহান্নামে (নরকে) যেতে হবে । সুতরাং ভাবুন ।

www.QuranerAlo.com

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

আসুন ইসলাম সম্পর্কে জানি

ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীছ এবং বিশুদ্ধ ইসলামি বই পড়তে হবে। তাহলে ইসলাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতে পারবেন। আপনি যদি মুসলিমদের দেখে দেখে ইসলাম সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে চান তাহলে ভুল করবেন। কারন অনেক নামধারী মুসলিম আছে যারা নিজেরাই ইসলাম সম্পর্কে জানে না । ইসলামের মূল গ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীছ এর উপর আমল করে না। তবুও আমি এখানে কুরআন ও হাদীছের আলোকে ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি মাত্র। আশা করি ইসলাম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

ইসলাম কি কোন নতুন দ্বীন (ধর্ম)?

অনেকের মাঝে একটি ভূল ধারনা আছে যে ইসলাম একটি নতুন দ্বীন (ধর্ম)। এটি সম্পূর্ণ ভূল ধারণা। পৃথিবীর শুরু থেকে ইসলামই একমাত্র দ্বীন (ধর্ম)। প্রত্যেক নবী-রাসূলদের দ্বীন ইসলামই ছিল। হয়ত এর রূপ ভিন্ন ছিল কিন্তু মূলত তা ছিল ইসলাম। প্রত্যেক নবীর একই দাওয়াত ছিল , **"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'** অর্থ্যাৎ **"আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই"**। অনেকেই মনে করে ইসলাম একটা নতুন ধর্ম-যা এসেছে ১৪০০ বছর আগে । আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন এ ধর্মের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা।[২২] কিন্তু এই ধারণাটা সঠিক নয় সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম এই পৃথিবীতে এসেছে সৃষ্টির শুরু থেকে। যখন থেকে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ মানুষ তথা আদম عليه السلام-কে পাঠিয়েছেন তখন থেকেই মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান, আইন-কানুন স্বরূপ ইসলামকে আল্লাহ দিয়েছেন। তাই ইসলাম কোন নতুন ধর্মের (দ্বীনের) নাম নয়, এমন নয় যে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এই ধর্ম তৈরি করেছেন, এর আগে ইসলাম ছিলো না, নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আগেও সকল রাসূলগণ عليهم السلام আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন । ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে সৃষ্টির শুরু থেকে। পৃথিবীতে প্রথম ধর্মই ইসলাম ।

- মহান আল্লাহ্ বলেন-**"আর মানুষ তো এক উম্মতই ছিল। পরে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ল। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে বাণী নির্ধারিত না হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করে।"** [সূরা ইউনুস ১০ ঃ ১৯]
- মহান আল্লাহ্ বলেন "**বল, 'আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি**

২২ অনেক নামধারী মুসলিমের লেখা বই বা অনেক ধর্মের নামে বাজারে চালু সস্তা বইতেও এমন কথা লেখা থাকে ।

Contents

কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'। [সূরা আল আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৯]

- মহান আল্লাহ্ বলেন **"এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও, আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য।"** [সূরা হাজ্জঃ ২২ ঃ ৭৮]

ইসলাম কী?

ইসলাম একটি আরবি শব্দ। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– অনুগত হওয়া, নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। পারিভাষিক অর্থে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের (পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার) নাম, যা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা, আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর অনুসরণ করা। শিরক থেকে পবিত্র হওয়া এবং মুশরিকদের থেকে মুক্ত হওয়ার পথ।[২৩]

ইসলামই একমাত্র সৃষ্টিকর্তার মনোনিত ধর্মঃ

আমাদের দ্বীন (ধর্ম) জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–**"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম"**। [সূরা আল-ইমরান ৩: ১৯]

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইমরান ৩: ৮৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন **"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআ'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।"** [সূরা মায়িদা ৫: ৩]

ইসলামে কি আছে ?

ইসলামে আসলে কি নেই ? এমন কোন শাখা নেই যা ইসলামে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামে কি আছে তা লিখতে লিখতে কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু লেখা শেষ হবে না। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা যা দরকার সবই ইসলামে রয়েছে। এ জন্যই ইসলামই একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা।

একটি পূর্নাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থায় যা দরকার তাই আছে শুধু ইসলামে। প্রকৃতপক্ষে কি যে নেই ইসলামে এটা খুজে বের করা দুষ্কর।

২৩ আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ১/১২৯।

www.QuranerAlo.com

ইসলামে আছে----আল্লাহর একত্ববাদ, পৃথিবী সৃস্টির ইতিহাস, মহাকাশ-বিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি,ন্যায়নিষ্ঠের বিচার-ব্যবস্থা, সমরনীতি, গৌরবদীপ্ত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, মুজাহিদদের সুমহান মর্যাদা, শহিদগণের সুমহান মর্যাদা, শহিদ হলে সরাসরি জান্নাতের গ্যার‍্যান্টি, সুন্দর চরিত্র গঠন, হালাল-হারামের বিধান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, নারীর ন্যায্য অধিকার, দাম্পত্য জীবন ও পরিবার ব্যবস্থাপনা, যৌন-শিক্ষা ও সাস্থ্যবিজ্ঞান, ইসলামে আছে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদি। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

ইসলামের মূল উৎস কী?

ইসলামের মূল উৎস দু'টি। কিতাবুল্লাহ তথা আল্লাহর কিতাব--আল-কুরআন ও সুন্নাতে নববী তথা নবী ﷺ এর ছহীহ হাদীছ।[২৪] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে গেছেন–

“আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় (দুটি জিনিস) রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ (আদর্শ/হাদীছ)”[২৫]

ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি। হাদীছে এসেছে,

“রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এর ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্জ করা এবং রমাযানের সিয়াম পালন করা।[২৬]

মুসলিম কে?

এক-কথায় ইসলামের পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ অনুসারীকে মুসলিম বলে ।

আল্লাহর কাছে যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়, আত্মসমর্পণ করে, আনুগত্য করে, এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদাত করে, সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত হয়, শিরককারীদের থেকে মুক্ত হয় এবং তার জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মেনে নেয়, প্রকৃতপক্ষে সে-ই মুসলিম, শান্তির পথযাত্রী।

---

[২৪] মূলত কুরআন ও হাদিছ দুইটাই ওহী । কুরআন সরাসরি আল্লাহর বাণী এবং হাদিছ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা যা নবী (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতী আল্লাহর নির্দেশে।

২৫ মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৩৩৩৮, ১৮৭৪; মিশকাত ১৮৬; সিলসিলা সহীহাহ ১৭৬১

২৬ সহীহ বুখারী ৮; সহীহ মুসলিম ১৬; সুনানে তিরমিযি ২৬০৯

মুশরিক কে?

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক/অংশীদার করে সে মুশরিক। অর্থাৎ যে আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদাত করল, অন্য কারও জন্য কুরবানী (জবেহ) মান্নত, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি পালন করল সে মুশরিক। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বাদ দিয়ে অন্য কারও বা অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টির জন্য কোন ইবাদাত করলে সেও মুশরিক (অংশীদারকারী)। সে জাহান্নামের (নরকের) পথিক।

কাফির কে?

কাফির [كافر - Kafir] একটি আরবি শব্দ, যা আরবি কুফর [كفر -Kufr] ধাতু থেকে আগত, যার শাব্দিক অর্থ হলো– ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা এবং এর ব্যবহারিক অর্থ হলো অবাধ্যতা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা সাধারণত **'অবিশ্বাসী'** হিসেবে একে অনুবাদ করা হয়। যে ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তাকে কাফির বলে। বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ বহন করছে। কাফির ব্যক্তি এ মহাসত্যকে দেখেও গোপন করে, অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে। মানুষ সব সময় আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। আগুন, পানি, আলো, বাতাস সবকিছুই আল্লাহর দান। মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, মস্তিষ্ক, জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ সবই আল্লাহর দান। এরপরও যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও তাঁর দ্বীন ইসলামকে অস্বীকার করে সে চরম অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও কাফির (অবিশ্বাসী)।

ঈমান কি?

ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাস স্থাপন করা।" পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ, মালাইকা (ফেরেশতা) কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ, আখিরাত বা পরকাল, তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দ-- এ ছয়টি মৌলিক বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। তাসদীক বিল যিনান বা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইকরার বিল লিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমাল বিল আরকান বা বাস্তবে আমলে পরিণত করাই হচ্ছে ঈমানের দাবি।

ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি ?

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ৬টি। যথা :

১. এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ তাঁকেই ইলাহ (উপাস্য) হিসেবে মেনে নেওয়া।

২. মালাইকাদের (ফেরেশতাগণের) প্রতি ঈমান আনা।

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।

Contents

৫. আখিরাতের (পরকালের) প্রতি ঈমান আনা।
৬. (তাকদীরের) ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

"রাসূল তার রব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও (বিশ্বাস করে); **তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে;** (তারা বলে) **আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করিনা এবং তারা আরো বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম; হে আমাদের রব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।"** [সূরা বাকারা ২: ২৮৫]

এছাড়াও রাসূল ﷺ-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, *"ঈমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের* عليهم السلام *প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা"*২৭

কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায় ?

কুরআন ও হাদীসে ইসলামে প্রবেশের রাস্তা অর্থ্যাৎ ঈমান বা বিশ্বাস আনার মূল হিসেবে **দুইটি** সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশে **'কালিমা শাহাদাত'** হিসেবে পরিচিত, একে **শাহাদাতাইন** বা **দুটি** সাক্ষ্যও বলা যায়। কোন অমুসলিম যদি মুসলিম হতে চায় তাকে এই কালিমার পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য দিয়ে এর শর্ত ও দাবিসমূহ মানতে হবে। তবেই কেবল মুসলিম হয়ে ইসলামে প্রবেশ করা যাবে। এই কালিমায় আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাত এর সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

কালিমাতুশ শাহাদাহ২৮ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ: আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহ।

অর্থ : *আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত/সত্য) ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।*২৯

এই কালিমা দুটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথম বাক্য: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। **অর্থ:** [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই]।

---

২৭ ইবনে মাজাহ: ৬৩।

২৮ বিস্তারিত আরও জানতে অবশ্যই পড়ুন " কালিমাতুশ শাহাদাহ" বই লেখক- গাজী মুহাম্মাদ তানজিল। Pdf ডাউনলোড করুন এই লিংক থেকে
http://www.waytojannah.com/wp-content/uploads/2016/02/Kalimatush-Shahadah.pdf
অথবা এই লিংক থেকে
https://ia600207.us.archive.org/10/items/KalimatushShahadah_201602/KalimatushShahadah.pdf

২৯ সহীহ বুখারী ৮৩১, সহীহ মুসলিম ২৩৪, ৪০২; আবু দাউদ ৯৬৭।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় বাক্য : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ 'ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ। অর্থ : [এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল]। আমরা পর্যায়ক্রমে এ কালিমার দুটি অংশেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ। প্রথমে আমরা প্রথম বাক্যটি নিয়ে আলোচনা করব।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর ব্যাখ্যা
[আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই]

- لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] মানে সকল বাতিল ইলাহকে বর্জন, আর إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] মানে শুধুমাত্র এক ইলাহ তথা আল্লাহকেই গ্রহণ।
- لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] মানে সকল গাইরুল্লাহ৩০ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আর إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] মানে শুধুমাত্র এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর দুটি অংশ :

এই তাওহীদি কালিমার দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি না-বাচক, আর দ্বিতীয় অংশটি হ্যাঁ-বাচক। প্রথমটি **বর্জনমূলক**, দ্বিতীয়টি **গ্রহণমূলক**।

[না] নেতি বাচক অংশ হলোঃ

لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] বা না-বাচক অংশের মর্ম হলো এই যে, কোন ইবাদাতই কারো জন্য করা যাবে না, কারো সার্বভৌমত্ব ও শক্তি স্বীকার করা যাবে না, কারো বিধান ও আইন-কানুন মানা চলবে না, কোন কিছুতেই কারো প্রভুত্ব স্বীকার করা চলবে না। এসবের কোন একটিতেও কারো বিন্দুমাত্র শরীক স্থাপন করা চলবে না।

[হ্যাঁ] ইতি বাচক অংশ হলোঃ

আর إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] বা হ্যাঁ-বাচক অংশের মর্ম হলো এই যে, শুধুমাত্র আল্লাহই সকল প্রকার ইবাদাতের প্রকৃত হকদার। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তারই বিধান ও আইন-কানুন বান্দার উপর প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হবে। সবকিছুতেই তার প্রভুত্ব রয়েছে এবং এ সমস্ত ব্যাপারে কেউ বিন্দুমাত্র তাঁর শরীক নেই। না কোন মালাইকা (ফেরেশতা), না কোন নবী বা কোন ওলী, না কোন জিন-শয়তান, না

৩০ আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুকেই গাইরুল্লাহ বলা হয়।

www.QuranerAlo.com

Contents

কোন জড়বৃক্ষ, না কোন মূর্তি, না কোন কবর মাযারের ওলী-দরবেশ ও পীর-ফকীর। যে ব্যক্তি কালিমার এই দুটি রুকনের অর্থ ও মর্ম ভালোভাবে বুঝে মেনে চলতে পারবে তার জন্য এই কালিমার ফযীলত ও উপকার লাভ করা সম্ভব, নচেৎ নয়।[৩১]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সারমর্ম

আমরা জানি, ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। আর তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ]। এ কালিমাকে স্বীকার করার অর্থ/মানে হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো মেনে নেয়া–

- আল্লাহকে এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, জীবন ও মৃত্যুর-মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা। আর কেউ তার একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব বা আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহকেই আমাদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু এর ব্যাখ্যা:

[এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল]

এই শাহাদাহ বা সাক্ষ্য প্রদানের দাবি ও চাহিদা হলো–

- রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু আদেশ করেছেন তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে চলা।
- পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করা।
- তাঁর দেয়া যাবতীয় বার্তা-সংবাদকে নির্দ্বিধায়-নিঃসন্দেহে সত্য বলে বিশ্বাস করা।
- তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।
- তাঁর দেখানো তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করা। শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু যোগ বা সংযোজন না করা এবং নিজের মনগড়া পন্থায় আল্লাহর ইবাদাত না করা।

আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী রহ. তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

---

৩১ মূলঃ কালিমার মর্মকথা, আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, পৃষ্ঠা-৫০

www.QuranerAlo.com

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এ কথা মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে নিচের বিষয়গুলো মেনে নেয়া:

- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ সংবাদ বাহক এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়োজিত বিশ্বমানবের একচ্ছত্র নেতা বলে স্বীকার করবে।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে মানব জাতির অনুসরণীয়, উৎকৃষ্টতম ও সত্য বিধান সহকারে প্রেরিত, এই বিধানকে কর্মজীবনে বাস্তব রূপ প্রদান করার দায়িত্বসহ নিয়োজিত মহামানব ও আল্লাহর সংবাদ-বাহক বলে জানবে।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ-কে স্বীয় প্রাণ, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু-বান্ধব এবং স্বীয় সম্মান ও সম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় রূপে জানবে।
- ✓ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্য কাউকে নবী-রাসূল ও আল্লাহর প্রত্যাদেশবাহী বলে স্বীকার করবে না।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত বিধানের কোন অংশের পরিবর্তন, বা সংশোধন করার অধিকার কোন ব্যক্তি, দল বা গভর্নমেন্টের আছে বলে বিশ্বাস করবে না।
- ✓ যে সকল বিচারালয়ের বিচারকার্য মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত আইনের (আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ) অনুসারে পরিচালিত হয় না, সেগুলিকে বিচার কাজের উপযুক্ত বলিয়া জানিবে না।[৩২]

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ)

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্রীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা। তাওহীদ (একত্ববাদ) হলো– এক বাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরূপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন। তাওহীদ হচ্ছে–একমাত্র সত্য ইলাহের (মাবুদের) জন্য একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দা হয়ে যাওয়া। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়াই হচ্ছে তাওহীদের মূল মর্ম। তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, কেবল আল্লাহকেই রব হিসেবে বিশ্বাস করা এবং স্বীকৃতি দেয়া। 'রব' অর্থ প্রতিপালক/লালনপালনকারী, তাই দুনিয়া জুড়ে সমগ্র সৃষ্টিকে লালনপালন করতে যা কিছুর প্রয়োজন হয়, সবকিছু কেবল একজনই করছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ অংশগ্রহণকারী নেই বা শরীক নেই। অর্থাৎ জানতে হবে, মানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা কেবলমাত্র আল্লাহ, অন্য

৩২ মূল: কালিমা তাইয়েবা- আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী রহ পৃ: ১০৫-১০৯।

কেউ নয়। তিনি রিযিকদাতা, মহাব্যবস্থাপক এবং সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি। সকল ক্ষমতার উৎসও কেবল তিনি। সমগ্র সৃষ্টিকুলের ইবাদাতের হকদার কেবল মাত্র, শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলা- এ কথা জানা, বিশ্বাস করা এবং বাস্তবে আমল করা। মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র দ্বীনকে খালিস করা এবং কেবল আল্লাহর জন্যই যে কোন ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা শিখাচ্ছেনঃ **"আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।"** [সূরা ফাতিহা ১: ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো শিখাচ্ছেনঃ **"তুমি বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য।"** [সূরা আল আনআম ৬:১৬২]

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যেসকল সুন্দর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলির বিবরণ এসেছে তা হুবহু আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত- এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণাঃ **"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।"** [সূরা ত্বাহা ২০:৮]

তবে কোন অবস্থাতেই আল্লাহর কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করা, বিকৃত ব্যাখ্যা করা, উপমা ও ধরন (সদৃশ) বর্ণনা করা চলবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" [সূরা শূরা ৪২:১১]

তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক !

শিরকের শাব্দিক অর্থ হলো, শরীক করা, অংশীদার স্থাপন করা। ইংরেজিতে বলা হয়– Polytheism, Associate, Partner. আর সাধারণ অর্থে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা বা আল্লাহর পাশাপাশি গাইরুল্লাহকে ইলাহ (উপাস্য) ও রব হিসেবে গ্রহণ করাকে শিরক বলে। অতএব শিরক হচ্ছে অংশীদারিত্ব আর এ অংশীদারিত্ব হচ্ছে আল্লাহর উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত এবং সিফাতের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা– অর্থাৎ সৃষ্টির ছোট-বড় কোন বস্তু যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, নবী-ওলী-দরবেশ, পীর-ফকির অথবা কোন নেক মানুষকে আল্লাহর সাথে পূর্ণ বা আংশিক সাহায্যকারী মনে করা। যেমন– মহান আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলির ক্ষেত্রে সৃষ্টি জগতের কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা। অন্য কথায় এমন বিশ্বাস, কাজ, কথা বা অভ্যাসকে শিরক বলা হয়, যার দ্বারা বাহ্যত মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও গুণাবলিতে অপর কারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা প্রতীয়মান হয়। শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ। শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে।

www.QuranerAlo.com

সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক !

১. দু'আ বা আহ্বানের ক্ষেত্রে শিরক: দু'আ বা আহ্বানের শিরক বলতে মানুষের ক্ষমতার বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা কোন পার্থিব ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা বুঝায়। যা বহুল প্রচলিত সুস্পষ্ট একটি শিরক। আল্লাহ বলেন--

"আরো এই যে, মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না।" [সূরা জিন ৭২: ১৮]

"সত্যিকার আহ্বান-প্রার্থনা তাঁরই প্রাপ্য, যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা তাদেরকে কোন জবাব দেয় না।" [সূরা রাদ ১৩: ১৪]

২. ফরিয়াদের ক্ষেত্রে শিরক: ফরিয়াদের ক্ষেত্রে শিরক বলতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকাকে বুঝায়। রোগ নিরাময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা।আল্লাহ বলেন--

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তারা (অন্যকে আল্লাহর সাথে) **শরীক করে বসে।"** [সূরা আনকাবুত ২৯:৬৫]

৩. আশা বা কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে শিরক: মানুষের অসাধ্য কোন বস্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কামনা করা। যেমন কোন পীরের কাছে সন্তান বা ধনসম্পদ ইত্যাদি কামনা করা। আল্লাহ বলেন--

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।" [সূরা শুআরা ৪২: ৪৯]

৪. তাওয়াফের ক্ষেত্রে শিরক: কাবা ঘর ব্যতীত অন্য কোন কবর (মাযার) ঘর বা বস্তুর তাওয়াফ করা। আল্লাহ বলেন,

"এবং স্মরণ করো যখন আমি কাবা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।" [সূরা বাকারা ২: ১২৫]

৫. যবেহের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য পশু যবেহ করা। চাই তা আল্লাহর নামেই করা হোক বা অন্য কারো নামে বা নবী বা জিনের নামে। আল্লাহ বলেন--

"তুমি বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য।" [সূরা আনআম ৬: ১৬২]

৬. আনুগত্যের শিরক: বিনা দলীলে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ ছাড়াই হালাল-হারাম জায়েয-নাজায়েযের ব্যাপারে কোন আলেম[৩৩]- বুযুর্গ বা উপরস্থ কারো সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, **"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম আর দরবেশদেরকে[৩৪] রব বানিয়ে নিয়েছে।"** [সূরা তাওবা ৯: ৩১] খ্রিস্টানরা তাদের আলেমদের উপাসনা করত না; তবে তারা হালাল হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে তাদের আলেমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিত। আর এটিই হচ্ছে শিরক।

৭. কবরের শিরক: কবরে শায়িত কারো জন্য ইবাদাত করা। অর্থাৎ সেখানে সালাত আদায় করা, সিজদা করা, তার নিকট কিছু চাওয়া, তার (ওসীলার) মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে কিছু চাওয়া, সেখানে মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন বলছে--**"আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেব-দেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুয়া'আকে, আর না ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসরকে।"** [সূরা নূহ ৭১: ২৩]

৮. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তানসন্তুতি দিতে পারে– এমন বিশ্বাস করা শিরক।

মহান আল্লাহ বলেন--, **"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"** [সূরা শূরা ৪২: ৪৯-৫০]

৯. যাদু করা শিরক এবং কুফর।আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পীর-পুরোহীত (পাদ্রি), ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির ওসীলা (মাধ্যম) গ্রহণ করা শিরক ।

১০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে জীবনবিধান প্রণেতা মনে করা: আল্লাহই একমাত্র মানব জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য আইন বিধানের অধিকার রাখেন। এ কাজের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেউ নন। কোন ব্যক্তি, শক্তি, প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন অথবা কোন দল যদি আল্লাহর দেয়া বিধানের হালালকে হারাম করে আর হারামকে হালাল করে তাহলে তা মেনে নেয়া বড় শিরক।

শিরক সম্পর্কে সহজ কথা:

- শিরক সমস্ত নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। শিরকের পাপের কোন ক্ষমা নেই। শিরকের পরিণতি ধ্বংস। মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ।
- শিরক মিশ্রিত ঈমান কখনই ঈমান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। জীবন বিপন্ন হলেও শিরক করা যাবে না।

৩৩ যেসব আলেম কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী চলে তাদের অনুসরণ করতে কোন সমস্যা নেই।

৩৪ এই আয়াতে أحبار (আহবার) দ্বারা ইয়াহুদীদের ধর্মপন্ডিত আর رهبان (রুহবান) দ্বারা নাসারাদেও (খ্রিস্টানদের) ধর্মপন্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে।

www.QuranerAlo.com

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

ওযু করার পর এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো সম্পাদিত হলে ওযু ভেঙ্গে যায়। নামায-রোযা ও অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও একই কথা। তেমনি এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো ঈমান আনার পর করলে, ঈমান ভেঙ্গে যায়। ঈমান ভঙ্গ হলে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে মুসলিম কাফির[৩৫] এ পরিণত হয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলো– আমরা ওযু ভঙ্গের কারণ জানি, সালাত (নামায) ভঙ্গের কারণ জানি, কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ আমরা অনেকেই জানি না। এমন অনেক মুসলিম রয়েছে যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ঈমান ভঙ্গের কারণ কী কী? তাহলে সে বলতে পারবে না। অথচ ঈমান আনার পূর্বেই এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

আসুন জেনে নিই **ঈমান ভঙ্গকারী ১০টি** বিষয়।

১. আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা:

আল্লাহর সাথে শরীক বিভিন্নভাবে হতে পারে।

যেমন--আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করা।

নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, **“কাজেই তুমি অন্য কোন ইলাহকে আল্লাহর সঙ্গে ডেকো না। অন্যথায় তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”** [সূরা শুআরা ২৬: ২১৩]

উল্লেখিত আয়াতে নবী ﷺ-কে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। অথচ নবীদের জাহান্নামী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যারা পীর, ওলী-আওলিয়া বা কোন কবরবাসীকে ডাকে, তাদের ইবাদাত করে, তারা ঈমান হারাবে এবং জাহান্নামী হবে যদি না তারা তাওবা করে মৃত্যুবরণ করে। কারণ এটা স্পষ্ট শিরক। আর এ ধরনের শিরক মুমিনকে ঈমানহীন করে দেয়।

২. আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে উকিল, সুপারিশকারী বা ভায়া-মাধ্যম তৈরি করা: শাফাআতের মালিক একমাত্র আল্লাহ ﷻ। তিনি বলেন,

“বলো, শাফাআত সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।” [সূরা যুমার ৩৯: ৪৪]

এক শ্রেণির লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তাদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ তাদের সুপারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই।

---

[৩৫] **কাফের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলি: দুটি মূলনীতি: প্রথম মুলনীতি** দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কারও নিকট যদি এ জ্ঞান এসে থাকে যে, বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে, এমতাবস্থায়ও যদি ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ না করে (বর্জন করে) তবে সে কাফির। কারণ ইসলাম অর্থই হলো, আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে (নির্দেশ বা নিষেধ) আসবে তার সব কিছুকেই গ্রহণ করা। **দ্বিতীয় মূলনীতিঃ** কিন্ড়ু যে দ্বীনের বিষয়টিকে গ্রহণ করল অতঃপর এর আদেশ-নিষেধ এর কোন কোনটির লঙ্ঘন করল এবং স্বীকার করল যে, সে অন্যায় করেছে, সে কাফির নয়। সে গুনাহগার হলো, খালিস অন্ড়রে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন ইনশা-আল্লাহ। এ দুটি মুলনীতির দৃষ্টিতে কেউ যদি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একটিমাত্র নির্দেশ কিংবা একটিমাত্র নিষেধকে জেনে-বুঝে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার বা বর্জন/ঘৃণা করে সে কাফির।

www.QuranerAlo.com

Contents

৩. কাফিরদেরকে কাফির মনে না করা:

কাফিরদেরকে কাফির মনে না করা বা তাদের প্রকাশ্য কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদসমূহ সঠিক মনে করা ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। আল্লাহ বলেন, **"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বড় হজ্জের দিনে[৩৬] মানুষদের কাছে ঘোষণা দেয়া হলো যে- আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রাসূলও।"** [সূরা তওবা ৯: ৩]

অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর কোন দায়দায়িত্ব নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, **"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা আর মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই সৃষ্টির অধম।"** [সূরা বায়্যিনাহ ৯৮: ৬]

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উত্তম বিধানদাতা মনে করা:

যদি কোন মুসলিম নবী করীম ﷺ এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ অথবা ইসলামী হুকুমাত ব্যতীত অন্য কারো তৈরি হুকুমাত উত্তম মনে করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ (বের) হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, মানুষের তৈরি আইন ও বিধান ইসলামী শরীয়ত থেকে উত্তম বা ইসলামের সমান, মানবসৃষ্ট বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা জায়েয, ইসলামী হুকুমাত বিংশ শতাব্দির জন্য প্রযোজ্য নয়; এগুলো মধ্যযুগীয়, ইসলামই মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ, ইসলামের সাথে পরকালীন সম্পর্ক, দুনিয়াবি কোন সম্পর্ক নেই ইত্যাদি– উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এসব কথাবার্তা কুফরীর শামিল। কারণ এটা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার হীন প্রচেষ্টা মাত্র।[৩৭]

৫. আল্লাহর কোন বিধান অপছন্দ/ঘৃণা করা:

যদি কোন মুসলিম আল্লাহর নবী ﷺ এর আনীত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ/ঘৃণা করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ/বের হয়ে যাবে, যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুর্ভোগ আর তিনি তাদের কর্মকে বিনষ্ট করে দেবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন।" [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ৮-৯]

৬. দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা:

যদি কোন মুসলিম মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত দ্বীনের কোন বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম। বলো, আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ।" [সূরা তওবা ৯: ৬৫-৬৬]

---

[৩৬] অর্থাৎ যিলহজ্জের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন।

[৩৭] ফাতাওয়া আল-মারআতুল মুসলিমা, ১/১৩৭।

www.QuranerAlo.com

যারা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কোন আশা নেই। এ ধরনের লোকদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা ত্যাগ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত আচরণ পরিত্যাগ না করে।

৭. যাদু-মন্ত্র করা :

যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভাল কিছু অর্জন বা মন্দ কিছু বর্জন করতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা ভাঙ্গন ধরাতে গোপন, প্রকাশ্য, মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে (ছেলে-মেয়ে) সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে চায় তবে তা সম্পূর্ণরূপে কুফরী। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে উভয়ই কুফরী করল। আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কী? তিনি বললেন (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।"[৩৮]

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের (কাফির-মুশরিকদের) সাহায্য-সহযোগিতা করা :

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এমন কাজ করে তবে সে কুফরী করল। মহান আল্লাহ বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয় সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা ৫: ৫১]

"হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ।" [সূরা মুমতাহিনা ৬০: ১]

৯. ইসলাম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নাজাত পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা:

যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন/জীবনব্যবস্থা/ধর্ম বা অন্য কোন পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে, কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল ইমরান ৩: ৮৫]

১০. আল্লাহর মনোনীত দ্বীন–ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া:

যারা ইসলাম অনুসারে আমল করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ/অখুশি বা ইসলাম মেনে চলবে না বা ইসলামকে ঘৃণা করবে, এরকম ব্যক্তি কাফির। মহান আল্লাহ বলেন,

---

[৩৮] বুখারী: ২৭৬৬, মুসলিম: ৮৯, সুনানে আবু দাউদ ২৮৭৪,সুনানে নাসাই ৩৬৭১।

www.QuranerAlo.com

Contents

"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।" [সূরা সাজদা ৩২: ২২]

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ; আর তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" [সূরা ত-হা ২০: ১২৪-১২৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আকীদাহ ও তাওহীদ গ্রহণের পর যদি কেউ উল্লিখিত বিষয়গুলিতে নিপতিত হয়, তবে সে ঈমান হারা হয়ে যাবে। তাকে তাওবা করে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। তাওবার ডাক দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

"বলো- হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সূরা যুমার ৩৯: ৫৩]

পঞ্চম অধ্যায়ঃ
আসুন কুরআন সম্পর্কে জানি

পৃথিবীতে একটা বই নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। একটা বই একটা জাতিকে আমূল বদলে দিয়েছে এমন নজির আর নেই। একটা জাতিকে একটা বই এসে পড়াশোনাতে ডুবিয়ে দিয়েছে এমন ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটেনি। পৃথিবীর লাখ লাখ লোক একটা বই আগা-গোড়া মুখস্থ করে রেখেছে এমন বই একটাই। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন অডিওবুক সেটি মানুষ শুধু পড়ে না, শোনেও, মুখস্থও রাখে। সেই বইটি দাবি করে সেটা এই পৃথিবীর না। কোনো মানুষ এই বইয়ের মেধাসত্ত্বের দাবি করেনি। এই বইটি দাবি করে এটি ভুলের উর্ধ্বে। এই বইটি দাবি করে তার প্রাণ আছে, সে প্রাণ দেয়, আলো দেয়, অন্ধকার সরায়, সত্য আর মিথ্যাকে আলাদা করে দেয়।

কোন বই সেটি? সেই বইটি হলো পবিত্র "আল-কুরআন"।

তাই আসুন সেই বইটি সম্পর্কে জানি ।

কুরআন কি আল্লাহর বাণী?

প্রত্যেক ধর্মের বিশ্বাসীরাই যেহেতু এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে সেহেতু এটি একটি কমন (সাধারন) বিশ্বাস। একটি গ্রন্থ (কিতাব) এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বাণী কি-না-সেটা বিবেচনায় নেয়ার আগে অবশ্যই দুটি শর্ত পূরণ করতেই হবে:

www.QuranerAlo.com

- **শর্ত-১:** গ্রন্থটিকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবি করতে হবে। অর্থাৎ গ্রন্থটি যে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বাণী-সেটা গ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে। দাবি করাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে গ্রন্থ নিজেকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবিই করেনি সেই গ্রন্থকে সৃষ্টিকর্তার বাণী হিসেবে বিশ্বাস করাটাই তো বোকামি। আগে তো দাবি করতে হবে-তারপরই না কেবল দাবিটা সত্য নাকি মিথ্যা এবং সেই সাথে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসবে। তারপর না যাচাই বাছাই।
- **শর্ত-২:** গ্রন্থটিকে ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি থেকে মুক্ত হতে হবে। একটি গ্রন্থকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবি করার পরও যদি তার মধ্যে সুস্পষ্ট ভুল-ভ্রান্তি বা অসঙ্গতি থাকে সেক্ষেত্রে সেই গ্রন্থটি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

এই দুটি শর্ত পূরণ করার পরই কেবল একটি গ্রন্থ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বাণী কিনা- বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে। সাধারভাবে কোন গ্রন্থকে শর্ত-১ পূরণ করতেই হবে। কারণ শর্ত-১ পূরণ করতে না পারলে সেই গ্রন্থ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই আসে না।

কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা তা যাচাই করতে চলুন কিছু বিষয় যাচাই করা যাক।

- **যাচাইয়ের বিষয়-১:** কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নিজেই বক্তা এবং সেই সাথে বেশ কিছু আয়াতে কুরআনকে অত্যন্ত জোর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবি করা হয়েছে। অতএব কুরআন খুব ভালভাবেই শর্ত-১ পূরণ করে। কিছু নমুনা:

কুরআনে আল্লাহ বলছেন--**"এ কিতাব বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।"** [সূরা আস-সাজদাহ ৩২ : ২]

আল্লাহ বলছেন **"বলঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।"** [সূরা আন-নাহল ১৬ ঃ ১০২]

"এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে।" [সূরা জাসিয়া ৪৫ : ২]

- **যাচাইয়ের বিষয়-২ :** কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে কুরআনের দাবিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু ফলসিফিকেশন টেস্ট ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। ফলসিফিকেশন টেস্টের নমুনা-- **"তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা ? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু অসঙ্গতি দেখতে পেত।"** [সূরা আন-নিসা ৪ : ৮২]

এই আয়াত অনুযায়ী কুরআনে সুস্পষ্ট ভুল-ভ্রান্তি বা অসঙ্গতি পাওয়া যায় না। অতএব অনেকটা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, কুরআন দ্বিতীয় শর্তও পূরণ করে। অধিকন্তু, নিজে গ্রন্থ লিখে এভাবে চ্যালেঞ্জ দেয়াটা আদৌ সম্ভব বা স্বাভাবিক না। মানব জাতির ইতিহাসে এমন চ্যালেঞ্জ কেউ কখনো দিয়েছেন বলেও জানা নেই। মানুষ কখনো এই ধরণের চ্যালেঞ্জ দেয় না বা দেয়ার সাহস পায় না। তাও আবার বেশ কয়েকটি ধাপে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে! কিছু নমুনা: **"বল, 'এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।"** [সূরা আল-ইসরা ১৭:৮৮]

আল্লাহ কুরআনে আরও বলছেন---**"আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফিরদের জন্য।"**[সূরা বাকারা ২ :২৩, ২৪]

- **যাচাইয়ের বিষয়-৩:** কুরআনে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এ পর্যন্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণীও ভুল প্রমাণিত হয়নি। ইতোমধ্যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অতএব সম্ভাবনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও সঠিক হওয়ার কথা। যেমন-ধরুন..মিশরের ফেরআউনের লাশ যা এখন বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)
- **যাচাইয়ের বিষয়-৪:** কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে সেই ধর্মগ্রন্থের নাম -কুরআন, ধর্মের নাম-ইসলাম, ও অনুসারীদের নাম-মুসলিম উল্লেখ করা হয়েছে **"রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।"** [সূরা বাকার ২:১৮৫] কুরআনে আল্লাহ বলছেন--**"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।** [সূরা মায়িদাহ ৫ :৩] '

কুরআন বলছে--**"তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর', উত্তরে সে বলল, 'আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম"**। [সূরা বাকারা ২ : ১৩১] ।

এই পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে সেই ধর্মগ্রন্থের নাম, ধর্মের নাম, ও অনুসারীদের নাম পাওয়া যায় না। সবগুলো ধর্মগ্রন্থের বহিরাবরণ খুলে ফেলে পরীক্ষা (গবেষণা) করে কাউকে যদি সনাক্ত করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে একমাত্র কুরআনকেই সনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

www.QuranerAlo.com

- **যাচাইয়ের বিষয়-৫:** কুরআনের দাবি অনুযায়ী কুরআনের পান্ডুলিপি এখন পর্যন্তও সংরক্ষিত আছে, আল্লাহ বলেন--**"নিশ্চয় আমি কুরআন[৩৯] নাযিল করেছি, অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।"** [সূরা আল-হিজর ১৫:৯]

এমনকি একদম শুরু থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ কুরআন (হিফজ) মুখস্থ ও রেখে আসছে। আল্লাহ বলেন **"আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?** "[সূরা আল-কামার ৫৪ : ১৭]।

আজ-ই যদি কোন দূর্যোগের দুর্বিপাকে পৃথিবীর বুক থেকে সবগুলো ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস (নষ্ট) হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটার অবিকল অনুলিপি তৈরী করা সম্ভব। যেহেতু লক্ষ লক্ষ হাফেজদের সম্পূর্ন কুরআন মুখস্থ আছে। তাই অবহেলা করার কোন উপায়ই নেই! সত্যিই কুরআন একটি মুজেজা (নিদর্শন) মানবজাতির জন্য।

- **যাচাইয়ের বিষয়-৬:** কুরআনে প্রসঙ্গক্রমে "This is the Truth- where in there is no doubt" **"এটাই সত্য যাতে কোন সন্দেহ নেই"**-কথাটি কয়েক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এমনি এমনি কি কেউ এতটা জোর দিয়ে এমন কথা বলতে পারে। যদি সে সৃষ্টিকর্তা না হয়? চিন্তা করুন।

- **যাচাইয়ের বিষয়-৭:** ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্মের আগেই তার পিতা মারা গেছেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে মাতা মারা গেছেন। সবগুলো পুত্র সন্তান ছোট বেলায় মারা গেছেন। এমনকি একজন ছাড়া বাদবাকি কন্যা সন্তানরাও তাঁর আগে মারা গেছেন। প্রায় সারাটা জীবন সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়েছে। অথচ এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলোর কিছুই কুরআনে নেই! শুধু তা-ই নয়, তাঁর জীবনের সাথে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিত্ব যেমন--খাদিজা, আয়েশা, আবু বকর, ওমর, ওসমান, ও আলী সহ আরো অনেকের জীবন বৃত্তান্ততো দূরে থাক তাঁদের নাম পর্যন্ত কুরআনে নেই! অথচ এক পালক পুত্রের নাম সহ নাম না-জানা অনেকের নাম কুরআনে এসেছে! অতীতের অনেক ঘটনাও কুরআনে এসেছে। এমনকি যীশু (ঈসা عليه السلام) খ্রিস্টের মাতা মরিয়ম (মেরির) নামে কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা আছে এবং মাতা মরিয়মকে (মেরিকে) নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানও দেওয়া হয়েছে। অথচ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মাতা-পিতা, স্ত্রী, ও ছেলে-মেয়েদের নাম পর্যন্ত কুরআনে স্থান পায়নি! বাস্তবে আদৌ কি সম্ভব! কুরআন যদি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নিজস্ব বাণী হতো অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের কিছু স্মৃতি, হৃদয়বিদারক দৃশ্য ও কিছু নিকটতম ব্যক্তিত্ব কুরআনে স্থান পাওয়ার কথা।

৩৯ এই আয়াতে الذكر "যিকর" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন।

Contents

অধিকন্তু, কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে সেই ধর্মগ্রন্থের (মেসেঞ্জারের) রাসূলের বিরুদ্ধে সমালোচকদের বিভিন্ন সমালোচনা ও অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে বিভিন্নভাবে উপহাস-বিদ্রূপ করে কুরআনে কিছু আয়াতও আছে। এমনকি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যক্তিগত জীবনের দু-একটি তিক্ত ঘটনাও কুরআনে স্থান পেয়েছে যেমন আল্লাহ বলেছেন--**"হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ?** (এর দ্বারা) **তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও,** (আল্লাহ তোমার এ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন কেননা) **আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু"** [সূরা আত-তাহরিম ৬৬ :১]

কুরআন নবীকে তিরষ্কার করে বলছে **"সে** (মুহাম্মাদ) **ভ্রকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি**[৪০] **আগমন করেছিল** (হে নবী!) **তুমি কি জান, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত।** [সূরা আবাসা ৮০:১-৪] কুরআন নবীকে সাবধান করে আরও বলছে **"আর ভবিষ্যতে তাদের** (মুনাফিকদের) **কোন লোক মারা গেলে তার** (জানাযার) **সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা এবং তাদের কবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে।** [সূরা তাওবা ৯ : ৮৪]

কুরআনের উপর নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর হাত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের উপহাস-বিদ্রূপ, অভিযোগ, ও তিক্ত ঘটনাগুলো কিন্তু সহজেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। অপরদিকে অন্য কোন মানুষ যদি মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রাসূল-নবী বানিয়ে কুরআন লিখতেন (যদিও অসম্ভব-কারণ নবী মুহাম্মাদ ﷺ সেই সময় জীবিত ছিলেন এবং এই অভিযোগকে খন্ডন করার জন্য কুরআনই যথেষ্ট) সেক্ষেত্রেও খুব স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের "কেন্দ্রীয় চরিত্র" হতেন নবী মুহাম্মদ ﷺ। যেমন-নিউ টেস্টামেন্টের "কেন্দ্রীয় চরিত্র" হচ্ছেন যীশুখ্রিস্ট/ঈসা عليه السلام ও গীতার "কেন্দ্রিয় চরিত্র" শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কুরআনের "কেন্দ্রীয় চরিত্র"" স্বয়ং আল্লাহ।

তারই গুনগান কুরআনে করা হয়েছে কারণ তিনিই প্রকৃত (সত্য) সৃষ্টিকর্তা। ফলে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষের এখানে থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার কথা। চিন্তা করেছেন কি? ভাবুনতো ব্যাপারটা।

- **যাচাইয়ের বিষয়-৮ঃ** কুরআনের একটি সূরাতে সংক্ষেপে স্রষ্টার (আল্লাহর) সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে- যাকে বলে "স্রষ্টাত্বত্তের কষ্টিপাথর"। যেমন-

---

৪০ এই আয়াতে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে । বিস্তারিত ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাসীর এ দেখে নিবেন ।

www.QuranerAlo.com

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।" [সূরা ইখলাস ১১২ : ১-৪]

যে কোন স্রষ্টার (ঈশ্বরের) ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে সে সঠিক স্রষ্টা (ঈশ্বর) কিনা। দেখুনতো যাচাই করে ।

তাহলে নিরপেক্ষ ও মুক্তমনে উপরের সবগুলো তদন্তের বিষয় সার্বিকভাবে বিবেচনা ও যাচাই-বাছাই করে দেখুন তো কুরআনকে কোন মানুষের বাণী হিসেবে প্রমাণ করা যায় কি-না। কুরআনে বিশ্বাসের স্বপক্ষে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে কেস (কারণ) দাঁড় করিয়েছেন। আগে তো কেস (কারণ) দাঁড় করাতে হবে, তবেই না কেবল সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের প্রশ্ন আসবে। এটাই যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম। ইচ্ছে করলে যে কেউ, যে কোন সময়, উপরেল্লেখিত যাচাইয়ের বিষয়গুলো যাচাইও করতে পারে। আশা করি তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে । অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের জন্যও এই যাচাইয়ের বিষয়গুলো অনুরুপভাবে যাচাই করে দেখা যেতে পারে আসলে সেই ধর্মগ্রন্থগুলো সঠিক (সত্য) কিনা ।

কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ !

মানব জাতির ইতিহাসে এমন চ্যালেঞ্জ কেউ কখনো দিয়েছেন বলেও মনে হয় না। মানুষ কখনো এই ধরণের চ্যালেঞ্জ দেয় না বা দেয়ার সাহস পায় না। তাও আবার বেশ কয়েকটি ধাপে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে! কিছু নমুনা:

প্রথম পর্যায়ে পূর্ণ কুরআন বানানোর চ্যালেঞ্জঃ

- মহান আল্লাহ বলেন **"তারা কি বলেঃ এই কুরআন তার (মুহাম্মাদের) নিজের রচনা ? বরং তারা অবিশ্বাসী। অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ বাণী নিয়ে আসুক।"** [সূরা তুর ৫২: ৩৩-৩৪]

দ্বিতীয় পর্যায়ে মাত্র দশটি সূরা বানানোর চ্যালেঞ্জঃ

- মহান আল্লাহ বলেন **"তারা কি বলে "সে** [অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ] **ওটা রচনা করেছে? বল, "তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আন, আর (**এ কাজে সাহায্য করার জন্য) **আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়েই থাক ।"** [সূরা হুদ ১১ : ১৩]

শেষ পর্যায়ে কেবল একটি সূরা বানানোর চ্যালেঞ্জঃ

- মহান আল্লাহ আরও বলেন **"আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না,**

Contents

তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফিরদের জন্য।" [সূরা বাকারা ২ : ২৩, ২৪]।

এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কেউ করতে পারেনি আর পারবেও না:

- মহান আল্লাহ বলেন "বল, 'এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।" [সূরা আল-ইসরা ১৭:৮৮]

এটা এমন এক বিষ্ময়কর কথা, যা মানব ইতিহাসে কোন গ্রন্থকারই নিজের বইয়ের পক্ষে দাবি করেননি এবং জ্ঞানবুদ্ধি থাকা অবস্থায় কোন মানুষই এমন সাহস করতে পারবেন না যে, সে কুরআনের মত একটা বই লিখে ফেলেছে।

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ চলে আসছে সেই কুরআন নাযিলের সময় থেকে অর্থাৎ ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে। শত শত লোক, শত শত সংগঠন এই চ্যালেঞ্জ এর মোকাবেলা করতে এগিয়ে এসেছে। চরমভাবে ব্যার্থ হয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তাদের সবাইকেই।

কুরআনের মত আরেকটি কিতাব লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার দুটি ঘটনা

এখানে আমি দুটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি যারা কুরআনের মত একটি কুরআন লেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের ঘটনা ।

- **ঘটনা-১:** লবিদ বিন রাবিয়া। তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি। তার শক্তিশালী ভাষা আর তেজোদ্বীপ্তভাব তাকে সারা আরবে পরিচিত করে তুলেছিল। তিনি যখন কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের কথা জানলেন তখন জবাবে একটি কবিতা রচনা করে কাবা শরীফের চৌকাঠের উপর ঝুলিয়ে রাখলেন। পরে একজন মুসলিম কুরআনের একটি সূরা লিখে ঐ কবিতার পাশে ঝুলিয়ে দেন।

লবিদ বিন রাবিয়া পরের দিন কাবার দরজায় এলেন এবং ঐ সূরাহ পাঠ করলেন। অত:পর বললেন---*"নি:সন্দেহে এটা মানুষের কথা নয় এবং আমি এর উপর ঈমান আনলাম (বিশ্বাস করলাম)"* অত:পর তিনি প্রকাশ্য কালেমা পাঠ করে মুসলিম হয়ে গেলেন। তিনি কুরআনের ভাব আর ভাষায় এতো বেশী প্রভাবান্বিত হন যে, পরবর্তীতে তিনি আর কোনদিন কোন কবিতাই রচনা করেন নি।

- **ঘটনা-২ :** দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ইবনে মুকাফ্ফা এর। যা ঘটে কুরআন নাযিলের প্রায় ১০০ বছর পর। এই ঘটনা প্রথমটির চাইতেও চাঞ্চল্যকর।

www.QuranerAlo.com

"ঘটনাটি এরকম, ধর্মবিরোধীদের একটি সংগঠন সিদ্ধান্ত নিল ওরা কুরআনের মত একটি বই লিখবে। এই লক্ষে ওরা ইবনে মুকাফ্‌ফার (মৃত্যু-৭২৭ খৃ:) এর কাছে এলো। যিনি ছিলেন ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং বিষ্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। তিনি তার নিজের কাজের উপর এতো বেশী আস্থাবান ছিলেন যে উনি সাথে সাথে রাজি হয়ে যান এবং বলেন এক বছরের মধ্যে তিনি কাজটি করে দিবেন। শর্ত ছিল এই এক বছরকাল সময়টা যাতে তিনি পুরোপুরি মনোযোগের সাথে সূরাহ রচনা চালিয়ে যেতে পারেন এ জন্য তার যাবতীয় সাংসারিক আর অর্থনৈতিক কাজের দায়িত্ব সংগঠনটিকে নিতে হবে।

ছ'মাস পেরিয়ে গেলে এবার তার সঙ্গীরা কি পরিমান কাজ হয়েছে জানার জন্য তার কাছে এলো। তারা দেখতে পেল বিখ্যাত ঐ ইরানী সাহিত্যিক অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হাতে একটি কলম নিয়ে বসে আছেন; তার সামনে রয়েছে একটি সাদা কাগজ এবং কক্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছিড়ে-ফারা কাগজের স্তুপ। অসীম প্রতিভাধর, যাদুকরী ভাষার অধিকারী ঐ ব্যক্তি আপন সর্বশক্তি ব্যায় করে ছয় মাস চেষ্টা করে কুরআন তো দূরের কথা একটি আয়াতও রচনা করে উপস্থাপন করতে পারেন নি। যা হোক শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত লজ্জিত ও নৈরাশ্যমনে তিনি তার কাজের সমাপ্তি টানেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল কুরআন নাযিলের ১০০ বছর পর। কুরআনের ঐ চ্যালেঞ্জ কত শতাব্দি পেরিয়ে গেছে আজো বিদ্যমান। এই চ্যালেঞ্জ থাকবে যতদিন পৃথিবী থাকবে। আছে কি কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ?

সত্য প্রত্যাখানকারীরা কি ভেবে দেখে না পৃথিবীর সকল তাগুতি শক্তি কিভাবে পরাজিত হয়ে আছে কুরআনের কাছে ?

কুরআনের আসলত্ব ! কিভাবে তা লেখা হয় ?

কুরআনের আসল হওয়া সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন মতবিরোধ না থাকায় কুরআনের পূর্বের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কুরআনের একটি বিশিষ্ট একক স্থান আছে। এ বৈশিষ্ট্য নিউ টেস্টামেন্টেও নেই, ওল্ড টেস্টামেন্টেও নেই। এ দুখানি গ্রন্থ যে কিভাবে সংযোজন/সংশোধন হতে হতে বর্তমান আকারে এসে দাড়িয়েছে ,তা যে কেউ পড়লেই বুজবে। কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি; কারণ কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ এর আমলেই লিখে ফেলা হয়েছিল। কিভাবে লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রক্রিয়া কি ছিল, একটু পরেই তা আমরা বর্ণনা করব।

ইহুদী-খৃষ্টান গ্রন্থে যে সংযোজন/সংশোধন হয়েছে, তা বর্তমানে প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু মানুষের দ্বারা কুরআনের রদবদল হওয়ার কোন আশংকা নেই ।

কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণ তা মুখস্থ করে ফেলতেন এবং তাঁর অনুসারী ও নিযুক্ত লেখকগণ তা লিখে ফেলতেন। সুতরাং কুরআনের শুরুই হয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে- ১. মুখস্থ করা ও

২.লিখে ফেলা এবং এ দুটিই হচ্ছে আসল হওয়ার প্রমাণ। বর্তমান বাইবেল,বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থের ক্ষেত্রে তেমন কোন বৈশিষ্ট্যও নেই, আসল হওয়ার প্রমাণও নেই। কুরআন মুখস্থ করা ও লিখে ফেলার ঐ প্রক্রিয়া মুহাম্মাদ ﷺ এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই আমলে, যখন অনেকেই লেখাপড়া জানত না, অর্থাৎ লিখতে পারত না, কিন্তু সকলেই মুখস্থ করতে ও আবৃত্তি করতে পারত তখন একটি বিরল সুবিধা ছিল এই যে, ওয়াহি লিখিত আকারে সংকলনের সময় একাধিক মানুষের আবৃত্তির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা সম্ভব ছিল।

কুরআনের অহি জিবরাইল عليه السلام ফেরেশতার মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ ﷺ উপর নাযিল হয়েছিল। এ নাযিল হওয়া বিশ বছরেরও অধিক কাল যাবত চালু ছিল। প্রথম নাযিল হয়েছিল ৯৬ নম্বর সূরা আল-আলাক এর কয়েকটি আয়াত ।

প্রথম অহি ছিল নিম্নরূপ:

“পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।” [সূরা আলাক ৯৬ : ১-৮]

এ অহিতে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পূর্ণরুপে অভিভুত হয়ে পড়েন। তিনি যে লিখতেও জানতেন না, পড়তেও জানতেন না।

প্রফেসর হামিদুল্লাহ তাঁর কুরআনের ফরাসী তরজমার ভূমিকা উল্লেখ করেছেন যে, এ প্রথম অহির একটি বিষয় হচ্ছে, *“মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে কলমের প্রশংসা” এবং এ জন্যই নবী ﷺ লিখিত আকারে কুরআন সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।”*

মুহাম্মাদ ﷺ এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই সেই সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া অহি লিখে ফেলা হয়েছিল। যেমন- কাফিররা কুরআন সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল... **“তারা বলে- ‘এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী যা সে [**অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ**] লিখিয়ে নিয়েছে আর এগুলোই তার কাছে সকাল-সন্ধ্যা শোনানো হয়।”** [সূরা ফুরকান ২৫: ৫]

এখানে নবীর দুশমনদের অভিযোগের উল্লেখ আছে। তারা তাকে ভন্ড বলে মনে করত। তারা এ গুজব ছড়াত যে, তার কাছে প্রাচীন উপকথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, এবং তিনি তা লিখিয়ে নেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিখিত দলিল যে প্রস্তুত করা হত, এ কথা মুহাম্মাদের ﷺ দুশমনেরাও উল্লেখ করেছে। সূতরাং কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লেখাও হয়েছিল। হিজরতের পরে নাযিল হওয়া একটি সূরায় আসমানী উপদেশমালা লিখিত পৃষ্ঠাসমূহের উল্লেখ সর্বশেষ বারের মত করা হয়েছে।

“আল্লাহর নিকট হতে একজন রসূল, যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ। যাতে আছে সঠিক বিধান।” [সূরা বাইয়িনাহ ৯৮: ২-৩]

সুতরাং কুরআনেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, নবীর আমলেই কুরআন লিখে ফেলা হয়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, তার অনুসারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কাতিব (লেখক) ছিলেন এবং তাদের মধ্যে যায়েদ বিন সাবিতের নামই সর্বাধিক বিখ্যাত।

www.QuranerAlo.com

প্রফেসর হামিদুল্লাহ তাঁর কুরআনের ফরাসী তরজমার (১৯৭১) ভূমিকায় নবীর ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়ে কুরআন লিখিত হওয়ার সময় যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে।

তিনি বলেছেন,*"সকল বিশেষজ্ঞই একমত হয়ে বলেছেন যে, যখনি কোন অহি নাযিল হত, তখনই নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর লেখাপড়া জানা সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে লিখিয়ে নিতেন এবং এ নতুন অহি পূর্বে নাযিল হওয়া অহির পরম্পরায় কোন জায়গায় বসাতে হবে তা বলে দিতেন। লেখা হয়ে যাওয়ার পর লেখককে তিনি তা পড়ে শুনাতে বলতেন এবং লেখায় কোন ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন। অপর একটি বিবরণে জানা যায় যে, প্রতি বছর রমযান মাসে নবী ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া সমুদয় অহি তেলাওয়াত করে জিবরাইল ফেরেশতাকে শুনাতেন তাঁর ইন্তিকালের আগের রমযানে জিবরাইল তাকে দিয়ে সমগ্র কুরআন দুবার পড়িয়ে নিয়েছিলেন একথা সর্বজনবীদিত যে, প্রতিদিন পাঁচ বারের নামাযে কুরআন পাঠ করা ছাড়াও সেই মুহাম্মাদের ﷺ আমল থেকেই মুসলিনগণ রমযান মাসে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সমগ্র কুরআন পাঠ করতে অভ্যস্ত।'*[৪১]

নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ইন্তেকালের (৬৩২ খৃষ্টাব্দে) কিছুদিন পরই ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর ؓ নবীর সাবেক প্রধান কাতেব (লেখক) যায়েদ ইবনে সাবিতকে এক কপি সম্পূর্ণ কুরআন নকল করে দিতে বলেন। উমরের (ভবিষ্যত দ্বিতীয় খলীফা) তত্ত্বাবধানে যায়েদ মদীনায় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে থাকা বিভিন্ন জিনিসের উপরে লেখা কুরআনের কপি একত্রিত করেন এবং হাফেজদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তাদের স্মৃতিতে মুখস্থ থাকা বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে একখানি পূর্ণাঙ্গ কুরআনের কপি প্রস্তুত করেন। এভাবে একখানি নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কুরআনের সংকলন প্রস্তুত করা হয়।

'যা হোক আসল কথা এই যে, প্রাচীন কুরআনের যতগুলি কপির সন্ধান এযাবত পাওয়া গেছে, তার সবগুলিই একই প্রকারের। তার মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই।"

অতএব কুরআনের এ অভিনব সংরক্ষনে কোনো সন্দেহ নেই ।

---

৪১ সূত্র -বইঃ বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান- লেখক- ড. মরিস বুকাইলি ।

www.QuranerAlo.com

কুরআনের সংরক্ষণকারী স্বয়ং আল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন **"কোন মিথ্যা এতে (কুরআনে) অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।"** [সূরা হা-মিম আস-সাজদাহ ৪১: ৪২]

মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন **"নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।"** [সূরা হিজর ১৫ :৯]

সূতরাং যে কিতাবের সংরক্ষনকারী স্বয়ং আল্লাহ সে কিতাব নিয়ে সন্দেহ (সংশয়) করার কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

কুরআন সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

কুরআন সম্পর্কে কুরআন প্রথমে যা বলে তা হলো--

- **"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।"** [.সূরা আলাক-আয়াত নং-৯৬: ১-৩]
- **"এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।"** [সূরা বাকারা-আয়াত নং-২: ২]
- **"তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।"** [সূরা আন-নিসা ৪ : ৮২]
- **"এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত নয়। উপরন্তু তা পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তার সমর্থক আর বিস্তারিত ব্যাখ্যাকৃত কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে (নাযিলকৃত)।"** [সূরা ইউনুস ১০ : ৩৭]
- **"আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা তিনি নাযিল করেছেন তা তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতেই নাযিল করেছেন। ফেরেশতারাও সে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"** [সূরা নিসা ৪: ১৬৬]

কুর'আনেই রয়েছে প্রকৃত বিজ্ঞানের ভান্ডার!

সপ্তম শতাব্দিতে কুরআন নাযিল হয়। মানুষ তখন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কুসংস্কার ও প্রাচীন উপকথায় বিশ্বাসী ছিল। তখন মানুষ মহাবিশ্ব, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, মানুষের সৃষ্টি, বায়ুমন্ডলের গঠন এবং জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় উপাদান ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানতো না। এই যেমন-

সে সময় তারা বিশ্বাস করত :

- পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয়।
- মানুষের শুক্রানুর ভিতরে ছোট্ট একটা মানুষ থাকে। ওটাই মায়ের পেটে বড় হয়।
- বাচ্চার লিঙ্গের জন্য মা দায়ি।
- ব্যাথা লাগে মস্তিস্কে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরকম এক সময়, যখন মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের এরূপ অবস্থায় সেই সময়েই নাযিল হয়েছিল আল-কুরআন। যাতে শুধু বিজ্ঞানের সাথে রিলেটেড অসংখ্য আয়াত রয়েছে। অথচ সেই কোরআনেরই ১ টি আয়াতও পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। বরং বিজ্ঞানেরই কিছু ভুল ধারণা পরবর্তিতে সংশোধন করলে দেখা গেছে, তা কুরআনের সাথে মিলে গেছে। এরকমই কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুরু করা যাক, সাথেই থাকুন। আশা করি বিষয়গুলি পাঠককে গবেষণা করতে উৎসাহিত করবে ।

১। আকাশের খুটি :

সেই সময়ে নাযিল হওয়া কুরআনে লেখা হল- আকাশের কোন দৃশ্যমান খুটি নেই। যেমন--**“আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ।”** [সূরা রাদ ১৩ : ২]

আমাদের বিজ্ঞান আজ জানিয়েছে আকাশ-মন্ডলির কোন দৃশ্যমান খুটি (স্তম্ভ) নেই। এর আছে একটি অদৃশ্য স্তম্ভ-মধ্যাকর্ষণ শক্তি! আর কুরআনও বলে দিচ্ছে একই কথা।

২। মহাবিশ্বের আদি অবস্থা :

আজকের বিজ্ঞান বলছে মহাবিশ্ব গ্যালাক্সিগুলো তৈরী হওয়ার পূর্বে সব পদার্থগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় একত্রে ছিল। চলুন দেখি দেড় হাজার বছর আগের কুরআন এ বিষয়ে কি বলে ? পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কুরআন বলেছে- **“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে।”** [সূরা হামিম আস সিজদাহ ৪১ : ১১]

কিভাবে এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কুরআনে এলো? সত্যিই অবিশ্বাস্য!

৩। মহাবিশ্বের প্রসারনশীলতা :

কুরআনে আল্লাহ বলছেন--**"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী "** [সূরা আয-যারিয়াত ৫১ : ৪৭]
মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল এটা এই কিছুদিন আগে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানী আরভিন সর্বপ্রথম আলোর লোহিত অপসারন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রমাণ করেন এ বিশ্বজগত সম্প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সিগুলো একটার থেকে আরেকটা দূরে সরে যাচ্ছে।
মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে কি শক্তিশালী কোন টেলিস্কোপ ছিলো, যা দিয়ে তিনি গ্যালাক্সিগুলোর সরে যাওয়া দেখেছিলেন ? তাহলে এ বাণী কার পক্ষ থেকে?

৪। বিগ ব্যাং থিওরি :

কুরআনে আল্লাহ বলছেন **"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল,[৪২] অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? "** [সূরা আম্বিয়া ২১ : ৩০]

আয়াতটি আমাদেরকে একেবারে পরিষ্কারভাবে বলছে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেরা একসময় একজায়গায় পুঞ্জিভুত (মিশে) ছিল। এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে এদের জন্ম হয়।

আজকের বিজ্ঞান কি বলে এ সম্বন্ধে ? ষ্টিফেন হকিং এর বিগ ব্যাং থিওরী আজ সর্বময় স্বীকৃত। এ থিওরী অনুযায়ী মহাবিশ্বের সকল দৃশ্য-অদৃশ্য গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টির শুরুতে একটি বিন্দুতে পুঞ্জিভুত ছিল এবং একটা বিশাল বিষ্ফোরণের মাধ্যমে এরা চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে। কিভাবে মরুভুমির বুকে সংকলিত দেড় হাজার বছর আগের একটি বইতে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা ধারণ করতে পারল ?

ডঃ মিলার বলেছেন, *"এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার পর কুরআন যে ঐশী গ্রন্থ তা মেনে নিতে বাধ্য হই। যারা প্রচার চালাচ্ছে কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ এর নিজস্ব বক্তব্য তাদের দাবি নাকচ করার জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।"*

ডঃ মিলার বলেছেন,*"দেড় হাজার বছর আগে ইসলামের নবীর পক্ষে কিভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কথা বলা সম্ভব, যিনি কোন দিন কোন স্কুলে পড়ালেখা করেন নি। কারণ এটি এমন এক বৈজ্ঞানিক বিষয়, যা সম্পর্কে তত্ত্ব আবিষ্কার করে মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরুস্কার পেয়েছেন এক বিজ্ঞানী।"* মিলারের মতে এই আয়াতে সেই বিগ ব্যাং এর কথাই বলা হয়েছে যার মাধ্যমে পৃথিবী, আকাশমন্ডলী ও তারকারাজি সৃষ্টি হয়েছে। এই বিগ-ব্যাং থিওরীর একটা অনুসিদ্ধান্ত হল *"অনবরত দূরে সরে যাওয়া গ্রহ নক্ষত্রগুলো একসময় আবার কাছাকাছি আসা শুরু করবে কেন্দ্রবিমুখী*

৪২ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আদিতে আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র ও পৃথিবী ইত্যাদি পৃথক সত্তায় ছিল না; বরং সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি। পরবর্তীকালে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। এটিই বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ থিওরী। সূত্র: আল-বয়ান ।

www.QuranerAlo.com

বল শুন্য হয়ে যাওয়ার ফলে এবং সময়ের ব্যাবধানে সব গ্রহ নক্ষত্র আবার একত্রে মিলিত হয়ে একটা পিন্ডে পরিনত হবে"।

কুরআনে আল্লাহ বলছেন **"সে দিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলীল-পত্রাদি। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। ওয়াদা পালন করা আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবই।"** [সূরা আম্বিয়া : ২১ : ১০৪]

কি কিছু বুঝা গেল ? এই হল কুরআন! বিজ্ঞানময়। অতএব উপদেশ গ্রহন করার আছে কি কেউ?

৫। কে স্থির আর কে গতিশীল ?

টলেমী বিশ্বাস করতেন থিওরী অফ জিওসেনট্রিজম এ। আর মতবাদটি হল- *"পৃথিবী একদম স্থির, আর সূর্য সহ সব গ্রহ নক্ষত্রগুলো ঘুরছে পৃথিবীর চারিদেকে।"* এ মতবাদটি ১৬শ শতাব্দি পর্যন্ত বিজ্ঞান হিসেবে টিকে ছিলো। এরপর কোপার্নিকাস এসে প্রমাণ করলেন,*"পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে।"* মাত্র ২৫ বছর আগেও বিজ্ঞান মানুষকে জানাচ্ছিল সূর্য স্থির থাকে, এটি তার নিজ অক্ষের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে না। কিন্তু আজ এটা প্রমাণিত যে পৃথিবী ও সূর্য দুটোই গতিশীল অর্থাত দুটোই ঘূর্ণায়মান । আর এদের দুজনের রয়েছে আলাদা কক্ষপথ। চলুন দেখি দেড় হাজার বছর আগের কুরআন এই ব্যাপারে কি বলে ?

কুরআন বলছে "(আল্লাহই) **সৃষ্টি করেছেন** রাত ও দিন **এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"** [সূরা আম্বিয়া ২১ : ৩৩]

কুরআন আরও বলছে **"আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞর** (আল্লাহর) **নির্ধারণ।"** [সূরা ইয়াসিন ৩৬ : ৩৮]

এই কিছুদিন আগে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যও স্থির নয় বরং গতিশীল এবং ২০ লক্ষ বছরে একবার তার নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তন করে। আর এর গতি ৭২০০০০ কিমি/ঘন্টা। কুরআন বলছে-**"বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের শপথ।"** [সূরা জারিয়াত ৫১ : ৭]

অর্থাৎ আকাশ, যা বহু পথ ও বহু কক্ষপথ দ্বারা পরিপূর্ণ । এটা প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বের অন্য তারকারাজিও স্থির নয় বরং গতিশীল। যার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান একাত্বতা ঘোষণা করেছে। অতএব এই কুরআনের উৎস কোথায়? ভেবে দেখবেন কি?

৬। বণ্যাক হোলস (Black Holes):

কুরআনে আল্লাহ বলছেন **"আমি শপথ করছি তারকারাজির অস্তাচলের । অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।"** [সূরা ওয়াক্বিয়া ৫৬ : ৭৫-৭৬]

এই ৫৬ নং সূরা ওয়াক্বিয়ার ৭৫ নং আয়াতটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, যেখানে তারকারাজি অস্ত যায় অর্থাৎ পতিত হয়। মহাবিশ্বে এমন জায়গা আছে, যেখানে তারকা পতিত হয়। ঠিক পরের আয়াতেই এটাকে, মহাসত্য বলে দাবি করা হয়েছে। মহাকাশে এরকম স্থান আছে, এটা মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার করা

www.QuranerAlo.com

হয়েছে। এই জায়গাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে বণ্ঢাক হোলস। এগুলোতে শুধু নক্ষত্র নয়, যে কোন কিছুই এর কাছাকাছি এলে, এখানে পতিত হতে বাধ্য।

৭। সাত আসমান (আকাশ) :

কুরআন বলছে **"পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"** [সূরা বাকারাহ ২ : ২৯]

আকাশ যে সাতটি সে বিষয়ে আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম। আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্পর্কে কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি কারণ তারা প্রথম আসমানের উপরে নভোযান নিয়ে কোনদিন যেতে পারেনি আর পারবেও না । তাই তারা সাত-আসমানে (আকাশে) বিশ্বাস করে না। যখন কোন প্রমাণ পাবে তখন ভবিষ্যতে হয়ত তারা বিশ্বাস করবে ।

৮। চাঁদের আলো কি নিজস্ব ?

কুরআন বলছে **"তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময়[৪৩] আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। "** [সূরা ইউনুস ১০ : ৫]

"কতই না কল্যাণময় তিনি যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর আলো বিকিরণকারী চাঁদ।" [সূলা ফুরকান ২৫: ৬১]

এই আয়াতে বলা হয়েছে 'বিকিরণকারী চাদঁ' অর্থ্যাৎ "চাঁদ-যার আছে ধার করা আলো"

চাঁদের আলো যে প্রতিবিম্বিত আলো অন্য কথায় ধার করা আলো একথাটা দেড় হাজার বছর আগের একটা বইয়ে আসাটা খুবই স্বাভাবিক, যদি সে বইটা হয় এমন এক মহাসত্ত্বার কাছ থেকে যিনি জাগতিক ধ্যান-ধারণার অনেক উর্ধ্বে। সুবহান-আল্লাহ। বিজ্ঞান সুস্পষ্ট কুরআনের সাথে এখন একমত। চিন্তা করুন কত উচ্চ বিজ্ঞানময় এই কুরআন!

৯। লোহার রহস্য :

কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন **"আমি আরো নাযিল করেছি লোহা , তাতে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।"** [সূরা হাদীদ ৫৭ : ২৫]

লোহার রয়েছে প্রচন্ড শক্তি যা আমরা সবাই জানি ।

বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, আমাদের সৌরজগতের কোন গঠন প্রনালী নেই যা লোহার উৎপত্তি ঘটাতে পারে। লোহা কেবলমাত্র সূর্যের চেয়ে বড় কোন নক্ষত্রেই তৈরী হতে পারে যেখানে তাপমাত্রা কোটি ডিগ্রির কাছাকাছি। এ রকম কোন গলিত নক্ষত্রের বিস্ফোরনের মাধ্যমেই লোহার উৎপত্তি সম্ভব। আর এই ধরনের বিস্ফোরনের মাধ্যমে সৃষ্ট লোহার টুকরাগুলো পরবর্তিতে পৃথিবীতে পড়ার ফলেই লোহা অস্তিত্বলাভ করেছে।

---

৪৩ প্রতিবিম্বিত আলো।

Contents

অর্থাৎ লোহা যে আকাশ থেকে এসেছে এটা বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে।

১০। সমুদ্রের পানির রহস্য :

কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন **"দু'টি সমুদ্রকে তিনিই প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয়,** (কিন্তু তা সত্ত্বেও) **উভয়ের মাঝে আছে এক আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। অতএব** (হে জ্বিন ও মানুষ!) **তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'মাতকে অস্বীকার করবে? "** [সূরা আর-রহমান ৫৫ : ১৯-২০]

সমুদ্রের এই বৈশিষ্ট্য অতি সাম্প্রতিককালে[৪৪] আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্রের সারফেস টেনসন এবং ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য এক সমুদ্রের পানি অপরটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হলেও মিশে যায় না। যেমন -গালফ অফ মেক্সিকোতে এর হাজার হাজার মাইলব্যাপি লোনা আর মিষ্টি পানির সাগর পাশাপাশি প্রবাহিত হলেও একটির পানি আরেকটির সাথে মিশে যায় না। কুরআন নাযিলের সময় মানুষের মাঝে পদার্থবিজ্ঞানের কোন জ্ঞান ছিল না আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মরুভুমির মানুষ। তাহলে এই কুরআনের উৎস্য কোথা থেকে?

১১। জমাট রক্ত বা আলাক :

কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন **"তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে।"** [সূরা আলাক ৯৬ : ১-২]

'আলাক' শব্দটির অর্থ আরবিতে 'জমাট রক্তপিন্ড', পরিষ্কারকারি যন্ত্র, জোক। যে কোন একটি বা একাধিক অর্থ নিতে পারেন আপনার পর্যবেক্ষনের জন্য, যাই নেন না কেন, তা ভ্রুনের বৈশিষ্টের সাথে মিলে যাবে! শব্দটির ব্যাবহার এতটাই যৌক্তিক! এটি কি খুব আশ্চর্য নয় যে, মাতৃ-গর্ভাশয়ে একেবারে প্রথম দিকে জন্ম নেওয়া জাইগট বা জিগট দেখতে ঠিক জোকের মত, গর্ভের দেয়ালে ঝুলেও থাকে ঠিক জোকের মত, এটা মায়ের দেহ থেকে খাবার নেয় অন্য কথায় মায়ের দেহ পরিস্কারের কাজ করে আর এটা জৈবিক গঠন ঠিক রক্তপিন্ডের মত ।

শত শত বছর আগে নিশ্চয়ই মানুষ জানতো না জাইগোটের এই বৈশিষ্টগুলো!

১২। আঙ্গুলের ছাপের ভিন্নতা :

কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন **"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলোকে একত্রিত করতে পারব না। হ্যাঁ, আমি তার আংগুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।"** [সূরা কিয়ামাহ: ৭৫ ঃ ৩-৪]

আজ প্রমানীত এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আলাদা আলাদা আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। অর্থাৎ কারো আঙ্গুলের অগ্রভাগই অন্য কারো সাথে পুরোপুরি একই হবে না। কারো ছাপই কারো সাতে মিলবে না। আর এ জন্যই এই ছাপ এখন ব্যবহার করা হয়

---

৪৪ Youtube এ " কুরআনের আয়াতের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ " লিখে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন সমুদ্রের পানির রহস্য । Youtube এ ভিডিও দেখুন এই লিংক থেকে https://www.youtube.com/watch?v=9mP248DDWJw

www.QuranerAlo.com

বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধনে। অপরাধি সনাক্তকরণের কাজেও ব্যবহৃত হয়। ১৯ শতকের পূর্বে মানুষ আঙ্গুলের ছাপকে শুধু কিছু ভাজ বলেই জানতো।

প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের ছাপ ভিন্ন, এটা ১৮৮০ সালে প্রথম আবিষ্কার করেন স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন।

১৩। জন্মের তিন ধাপ :

মহান আল্লাহ বলছেন--**"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মায়েদের গর্ভে, এক এক পর্যায়ে এক এক আকৃতি দিয়ে, তিন তিনটি অন্ধকার আবরণের মধ্যে। এই হল তোমাদের প্রতিপালক, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই** (ভুয়ো ক্ষমতার অধিকারী, দাম্ভিক ও স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক) **তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?"** [সূরা যুমার ৩৯ : ৬]

আধুনিক এমব্রয়লজি বিজ্ঞান জানিয়েছে গর্ভাশয় তিনটি দেয়াল বা স্তর নিয়ে গঠিত। ১.ইন্টেরিয়ার এবডোমিনাল ওয়াল ২.ইউটেরাইল ওয়াল ৩. এমনিওকার্ডিওনিক মেমব্রেন। ভ্রূনের বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে কুরআনে বলা তিনটি অন্ধকার স্তর এবং বাস্তবে পাওয়া তিনটি স্তর মিলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ কুরআন সকল বিজ্ঞানের উর্ধ্বে। বিজ্ঞান ভুল করতে পারে কিন্তু কুরআন ভুল করতে পারে না।কারণ এটা মহান সৃস্টিকর্তার বাণী।এখনো কি বিশ্বাস হচ্ছে না !

১৪। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি: কোনটা আগে?

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন **"তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন রূহ নিজের পক্ষ থেকে। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"** [সূরা সেজদাহ ৩২ : ০৯]

মহান আল্লাহ বলেছেন **"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।"** [সূরা ইনসান ৭৬ : ২]।

অর্থাৎ কুরআন বলছে মানুষ আগে শ্রবণশক্তি আর তারপর দৃষ্টিশক্তি পায়। আসলে কি তাই? চলুন দেখি । বিজ্ঞানীরা বলেন- গর্ভে পাঁচ মাস থাকার পর ভ্রুনের শ্রবণ ইন্দ্রিয় তৈরী হয়। পরবর্তিতে সাত মাস থাকার পর ভ্রূনের চোখ তৈরী হয়।

কি ধ্রুব-বিজ্ঞানময় এই কুরআন! সত্যিই অবাক করার মত, তাই না?

১৫। পাখিদের গতিপথ :

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন **"তারা কি আকাশে** (উড়ন্ত অবস্থায়) **নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না ? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে** (স্থির) **রাখে না। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা বিশ্বাস করে।"** [সূরা নাহল ১৬ : ৭৯]

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার কি ? আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, পাখিদের মাথায় উড়ে বেড়ানোর প্রোগ্রামিং করা আছে। আর এই কারনেই ছোট ছোট পাখি আগে কোন রকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও হাজার হাজার মাইল উড়ে বেড়িয়ে আবার নিজ বাসায় ফিরে আসতে পারে। এই যেমন শীতকালে আমাদের দেশে সাইবেরিয়া থেকে এভারেস্ট এর উপর দিয়ে উড়ে আসে অতিথি পাখিরা। শীত শেষে আবার

www.QuranerAlo.com

চলে যায় নিজের বাসায়। এই বিশাল দূরত্ব (মাত্র ৬৫০০ মাইল গড়ে) পারি দিতে ওদের কোন গাইড লাগে না! কে তাদের মাথায় রাস্তা চেনার এই ক্ষমতা দিয়েছে। আর কেউ না, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ।

১৬। পিপিলিকার সমাজ :

কুরআন বলছে **"সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল, জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বুহ্যে বিন্যস্ত করা হল। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপীলিকা বললঃ হে পিপীলিকা বাহিনী ! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।"** [সূরা নামল ২৭ : ১৭-১৮]

কি ভাবছেন ? কুরআনে এসব রূপকথার গল্প লিখা হয়েছে কেন ?

হে বিজ্ঞানপ্রেমী, এগুলো এখন আর রূপকথা নয়! আপনার বিজ্ঞান ঘোষনা করে দিয়েছে, মানুষের সাথে সামাজিক কাঠামোয় সবথেকে মিল যে প্রাণীর সেটা পিপীলিকা। বিজ্ঞানিরা আরো জানিয়েছে পিপীলিকারা নাকি ওদের মৃতদেহ কবর দেয়, ওদের সমাজের কাজ নাকি ভাগ করে করে, ওদের নাকি আছে ম্যানেজার, সুপারভাইজার, শ্রমিক ইত্যাদি ব্যবস্থা! ওরা নাকি ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মানুষের মত খাদ্য মজুদ করে, আরো অবাক করা কথা কি জানেন, ওদের মজুদকৃত শস্য-দানায় যদি কুড়ি গজায় তো ওরা কুড়িগুলো কেটে ফেলে, যেন ওরা জানে, এই কুড়িগুলো ওদের শস্যকে নষ্ট করে দিবে। আর কোনভাবে শস্যদানাগুলো ভিজে গেলে, ওরা ওগুলো বাইরে এনে শুকাতে দেয়। যেনো ওরা জানে, এগুলো না শুকালে শস্যগুলো পচে যাবে!

পিপীলিকাদের এই উন্নত প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের জানালো এই কিছুদিন আগে। আর কুরআন জানিয়েছে– ১৪০০ বছর আগে! কি, অবাক হচ্ছেন ?

১৭। পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যতবাণী : ফেরাউনের লাশ সংরক্ষন :

কুরআনে আছে ফেরাউন ডুবে মারা গেছে আর মৃত্যুর পরও তার শরীর অক্ষত রাখা হবে, যা পরবর্তী সীমালংঘনকারীদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে।

"আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম আর ফির'আওন ও তার সৈন্য সামন্ত ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন ক'রে তাদের পেছনে ছুটল, অতঃপর যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই যাঁর প্রতি বানী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' "এখন (ঈমান আনছ), **আগে তো অমান্য করেছ আর ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত থেকেছ। 'সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফেল'।"** [সূরা ইউনুস ১০ : ৯০- ৯২]

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি ফেরআউনের লাশ তথা তার দেহ কে রক্ষা করবেন যাতে পরবর্তী মানুষদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে যে, জালিম ও সীমালংঘনকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল এটা দেখানোর জন্য।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে *"থেবস" নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ আমলের কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল।১৯০৬ সালে নৃতত্ত্ববিদ ক্রাকো ইলিয়াট স্মিথ অনেকগুলো মমি খুলে মমিগুলোর মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান করেন । এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করে ১৯০৭ সালে ফেরাউনের লাশ সনাক্ত করেন। ঐ সময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমেছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরুপ (লবনের স্তর) পাওয়া যায়নি।*[৪৫] যা আজ মিশরের কায়রোতে দ্যা রয়েল মমী হলে একটি কাচের সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২০২ সেন্টিমিটার তথা-- ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি । প্রায় ৩১১৬ বছর পানির নীচে থাকা সত্ত্বেও তার লাশে কোন পচন ধরে নি। এটা কি মোটেও যৌক্তিক ? মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগের আরব জাতি ও অন্যরা মিশরীয়দের মধ্যে, ফেরাউনের পানিতে ডুবে মারা যাওয়া কিংবা তার লাশ যে সংরক্ষিত হবে এরকম ভবিষ্যতবানী করা এবং তা মিলে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। তাহলে এই কুরআনের উৎস কোথা হতে ? ভেবে দেখবেন কি ?

বিশ্বনবীর একটি বাণী তথা -*"তোমাদের কারও পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে এর পরিশোধনের নিয়ম হচ্ছে, একে সাতবার ধুয়ে নিবে।"*[৪৬]

এই বানী কে নিয়ে ডাঃ কুক একটি পাত্রে কুকুরের জীবানু নিয়ে ৫ বার ধৌত করে গবেষণা করার পর দেখলেন এখনো ঐ পাত্রে জীবানু আছে। যখন তিনি বিশ্বনবীর বাণী মোতাবেক ৭ বার ধৌত করার পর যখন গবেষনা করতে লাগলেন, তখন দেখতে পেলেন ঐ পাত্রে কোনো জীবাণু নেই।

তখন তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, *"আমি ডাঃ কুক ১৬ বছরের পড়াশুনা ও ১০ বছরের গবেষনা মোট ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে জোর আওয়াজে বলতে পারি, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।"*[৪৭]

হে সত্যান্বেষী! আপনি নিশ্চয়ই জানেন মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি! কুরআনে এর এই অলৌকিক ভারসাম্যকে যদি কেউ বুঝে, সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে এটা এমন একটা গ্রন্থ (বই) যেটার মত লেখা, মানুষের ক্ষমতা ও শক্তির বাহিরে। এর পিছনে হাত আছে এক মহান শক্তির। মহান স্রষ্টার । অতএব চিন্তা-গবেষণা করুন এই কুরআন নিয়ে।

---

৪৫ সূত্রঃ মাওলানা মওদুদী (রহ.), রাসায়েল ও মাসায়েল,(ঢাকা ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃ: তানতাভি জওহারী (মৃ: ১৯৪০ খৃ:),আল জাওয়াহের ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারিম, (বৈরুত দারুল ফিকর, তাবি) তাফসীর সূরা ইউনূস ৯২ দ্রঃ ৬/৮৪ পৃ; ।

৪৬ সহিহ বুখারী-১৭২ ।

৪৭ বিস্তারিত জানতে পড়ুন "সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান"।

www.QuranerAlo.com

কুরআন ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে সেই ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এই প্রশ্নগুলোর সমাধান কি ?

কিছু প্রশ্নের তালিকা দিচ্ছি, এর উত্তর পাওয়া যাবে কি, কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ (কিতাব) থেকে ??? আশা করি পাওয়া যাবে না। কারণ, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ হলো অসম্পূর্ণ গ্রন্থ (কিতাব)। মানুষ কর্তৃক সংযোজিত/সংশোধিত গ্রন্থ। এর মধ্যে মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান পরিপূর্ণভাবে নেই।

প্রশ্নসমূহ:

- **প্রশ্ন-১:** কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ যে *"সৃষ্টিকর্তার বানী"* এরকম জোরালো দাবী কোন ধর্মগ্রন্থে করেছে ? **উত্তর:** না। কিন্তু কুরআন দাবী করছে!
- **প্রশ্ন-২:** কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ যে *"নির্ভুল/সঠিক কোন সন্দেহ নেই"* এরকম দাবী কোন ধর্মগ্রন্থে করেছে? **উত্তর:** না। কিন্তু কুরআন দাবী করছে!
- **প্রশ্ন-৩:** কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ কোন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে কি সৃষ্টিকর্তার বাণী হিসেবে ? যেমন ধরুন এরকম--*"এ গ্রন্থ যদি সৃষ্টিকর্তার বাণী না হয় তাহলে এর মত একটি গ্রন্থ (কিতাব) রচনা করে দেখাও"?* **উত্তর:** না। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ এরকম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন !
- **প্রশ্ন-৪:** কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ কি কোন মানুষের সম্পূর্ণ মুখস্থ আছে? **উত্তর:** না। অথচ সম্পূর্ন কুরআন সেই ১৪০০ বছর আগে থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের মুখস্থ রয়েছে। এটাই কুরআনের মুজেজা (নিদর্শন)।
- **প্রশ্ন-৫:** কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ যদি সঠিক হয় তাহলে তাতে মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান আছে কি? **উত্তর:** না। কিন্তু কুরআনেই রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান ।

.....বর্তমানে অনেক সমস্যায় মানব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে এসব সমস্যার পরিপূর্ণ বাস্তবসম্মত সমাধান বেদ,গীতা, বর্তমান তাওরাত, ইঞ্জীল (বাইবেল) দিতে পারবে না। সব কিছুর সমাধান এ সব কিতাবে নেই। কারণ, এগুলোর অধিকাংশই মানুষ কর্তৃক সংযোজিত/সংশোধিত কিতাব। আর কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান আছে। কারণ এটা মানুষের স্রষ্টার কালাম (বাণী)। যিনি স্রষ্টা তিনি মানুষের সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালো করে জানেন। তাই তিনি মানুষের সকল সমস্যার সমাধান তার এই কালামে (কুরআন) ও তার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর বাণী (হাদীছের) মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

আসুন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে জানি

আসুন আমরা এবার জেনে নেই সেই প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে যাকে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন।

আমাদের প্রিয় নবী--মুহাম্মাদ ﷺ তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম - আমিনাহ, দাদা: আব্দুল মুত্তালিব। তিনি ৫৭০ মতান্তরে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের হস্তি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ মতান্তরে ১২তারিখ সোমবার দিন কুরাইশ বংশের বনু হাশেম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮]

দৈহিক গঠন: তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন না এবং বেটেঁও ছিলেন না । বরং মানুষের মাঝে মধ্যম আকৃতির ছিলেন। গায়ের রং অতিরিক্ত ফর্সা বা কালো ছিল না, বরং সাদা-লাল মিশ্রিত গৌরবর্ণ ছিল। মাথার চুল কোকড়ানো বা সোজা ছিল না, বরং কিছুটা ঢেউ খেলানো ছিল। মাথা বিরাটাকায় ছিল। মুখমন্ডল সর্বাধিক সুন্দর ছিল। বারা বিন আযিব رضي الله عنه এর বর্ণামতে বারা বিন আযিব رضي الله عنه এর বর্ণামতে, "*রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মোবারক চাঁদের ন্যায় উজ্জল ও সুন্দর ছিল*'[৪৯]।"*মুখায়ব সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, বরং কিছুটা গোলাকার ছিল।*'[৫০] উভয় কাধের মধ্যবর্তীস্থান প্রশস্ত ছিলো। দাড়ি ঘন সুন্দর বক্ষদেশ ছেয়ে প্রলম্বিত ছিল।

মুহাম্মাদ সাঃ কে সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

অনেক মুসলিম ও অমুসলিমের ধারণা যে মুহাম্মাদ ﷺ কে বুঝি শুধু মুসলিমদের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুহাম্মাদ ﷺ কে সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। শুধু মুসলিমদের জন্য নয় সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের, সকল মানুষদের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল (বার্তাবাহক) হিসেবে পাঠিয়েছেন। যেমন-আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন- **"আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"** [সূরা আম্বিয়া ২১ : ১০৭]

অন্য কোন নবী-রাসূলকে عليهم السلام সবার জন্য পাঠানো হয়নি।

---

৪৮ সূত্র: [আর-রওদুল উন্‌ফ (১/২৮২)] [আস-সিরাতুন নববিয়াহ (১/১৯৯)] [যাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা- ১/৭৬] [নূরুল ইয়াকিন ফি সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা-৯; আরও দেখুন: আর-রাহিকুল মাখতুম (পৃষ্ঠা নং: ৪১)]

৪৯ সহিহ মুসলিম-২৩৪৪ ।

৫০ তিরমিযি হাদিস নং-৩৬৩৮

www.QuranerAlo.com

Contents

সকল শ্রেণীর মানুষের একমাত্র আদর্শ সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ

আল্লাহ তায়ালার কাছে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হলেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য সুন্দরতম নমুনা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেন: **"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"** [সূরা আল কালাম ৬৮: ৪]

তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুপম (মডেল) আদর্শ। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"** [সূরা আহযাব ৩৩ : ২১]

মহানবী ﷺ শুধু মুসলিমদের জন্য শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানব নন। বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল বিশ্ববাসীর জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"** [সূরা আম্বিয়া ২১ : ১০৭]

আমেরিকার খ্রিস্টান পন্ডিত Michael H. Hart ১৯৭৮ সালে তার রচিত "The Hundred Ranking of the most influential Person in the history" বইতে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: "He was the only man in history who was suprimely successful on both the religious and secular levels" *"তিনি (নিজ) ধর্মের ও অন্যান্য ধর্মের উপর ইতিহাসে একমাত্র সর্বোচ্চ সফল ব্যক্তি ছিলেন"*

এতে তার অনেক ভক্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে পাগল বলেন। তখন তিনি তাদের প্রতি উত্তরে বলেন *'প্রিয় বন্ধুরা আমি পাগল হইনি; যার নাম সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তার জন্য পাগল হয়েছে।"* সত্যিই খুব সুন্দর কথা বলেছেন তিনি ।

আদর্শ মানব হিসেবে নবী মুহাম্মাদ ﷺ :

প্রকৃত অর্থে রাসূল ﷺ সকলের জন্য আদর্শ মানুষ ,পথ প্রদর্শক ও আদর্শ শিক্ষক ।
রাসূল ﷺ যে আদর্শ মানুষ তা-বুঝার সুবিধার্থে এবং লেখা সংক্ষিপ্ত করার জন্য তার জীবন চরিত্রকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হলো।

১) ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ
২) পারিবারিক জীবনে আদর্শ
৩) সামাজিক জীবনে আদর্শ
৪) অর্থনৈতিক জীবনে আদর্শ
৫) রাজনৈতিক জীবনে আদর্শ
৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদর্শ
৭) শিক্ষা জীবনে আদর্শ

www.QuranerAlo.com

৮) বিচার ব্যবস্থায় আদর্শ
৯) জিহাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আদর্শ

১. ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ : রাসূল ﷺ এর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। তাঁর এই গুণের কারণে অসভ্য বর্বর আরব জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সম্ভব হয়েছিলেন, যার ফলে তিনিই প্রথম 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসি উপাধি লাভ করেন। অথচ তখনও তিনি নবী হননি। চরম শত্রুও তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত রাখত সংকোচহীনভাবে। তিনি সেগুলো হেফাজত করতেন পূর্ণ আস্থার সাথে। ব্যক্তিগত জীবণে অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছিলেন। যা মানুষের জন্য খুবই অনুসরণীয় আদর্শ।

২. পারিবারিক জীবনে আদর্শ : পারিবারিক জীবনে রাসূল ﷺ অনুপম আদর্শের প্রতীক। পারিবারিক জীবনে তিনি পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ, ছোট-বড় সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এমনকি পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের অধিকারও নিশ্চিত করেছেন এবং পারিবারিক কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করেছেন। এমনকি চাঁদনী রাতে নবী ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা রাঃ সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন। তাই তিনি ব্যাক্তিগত জীবনেও আদর্শ পুরুষ।

৩. সামাজিক জীবনে আদর্শ : রাসূল ﷺ এর আগমনের প্রাক্কালে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বিপর্যময় ও দূর্বিষহ। সামাজিক অনাচার পাপ পঙ্কিলতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে তারা সব সময় মদ, জুয়া আর নারী নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এমনকি তারা নিজের জীবিত কন্যা শিশুকে কবর দিত। এমন বিপর্যয় পূর্ণ অবস্থায় ওহীবিহীন জিন্দেগির ৪০টি বছর সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্মসূচির উদ্যোগ নিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী ﷺ বলেছেন: "*প্রকৃত মুসলিম সে-ই যার হাত ও জিহবা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।*"[৫১]

তিনি আরও ঘোষণা করেছেন: *"যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার সম্পর্কে জানে না (সম্মান করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"*[৫২]। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দারুণভাবে উপেক্ষিত। মানুষের রচিত মনগড়া আইন (সংবিধান) ও বিভিন্ন মতবাদের যাঁতাকলে মানবতা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এ থেকে বাঁচতে হলে রাসূল ﷺ এর অনবদ্য জীবনের এক বিশাল সমুদ্রে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে।

৪. অর্থনৈতিক জীবনে আদর্শ : রাসূল ﷺ কাছে ওহী আগমণের পূর্ব আরববাসীরা লুণ্ঠন, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, দুর্নীতি ইত্যাদি

---

৫১ সহীহ বুখারী হাদিস নং ১০
৫২ আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯; মুসনাদে আহমাদ হা/৭০৭৩; ছহীহাহ হা/২১৯৬

www.QuranerAlo.com

Contents

হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করত। সুদ ছিল অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার। আর রাসূল ﷺ এগুলো সবকিছু হারাম ঘোষণা করে দেন। তিনি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বাতিল করে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করেন। যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরিবদের দেয়া হবে। সম্পদ অপচয় ও অপব্যয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন যদিও তা নিজের হয়। তিনি সুদ এবং মজুতদারীকে হারাম ঘোষণা করেছেন, যাতে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছুলোকের হাতে কুক্ষিগত না হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

"যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে" [সূরা আল হাশর ৫৯ : ৭]

তিনি গ্রাম ও শহরের যাকাত দাতাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে; প্রথমে গ্রামের গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে জমা করতেন। রাসূল ﷺ এর প্রণীত অর্থনীতির প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়েছিল। ফলে খলিফা ওমর رضي الله عنه খিলাফতের সময় যাকাত দেয়ার জন্য পথে-পথে ঘুরেও যাকাত গ্রহণ করার মত কোনো লোক পাওয়া যেত না। তাই এ কথা বলতেই হয় অর্থনৈতিক মুক্তিতে রাসূল ﷺ এক মাত্র পথপ্রদর্শক ও অনুসরনীয় ব্যাক্তিত্ব।

৫. রাজনৈতিক জীবনে আদর্শ: রাসূলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

কায়েমি নেতৃত্ব পরিবর্তনে রাসূলের কর্মপন্থা : কোনো নবীই প্রচলিত নেতা বা শাসকদের নিকট নেতৃত্বের গদি দাবি করেননি। ইবরাহিম عليه السلام নমরুদের নিকট, মূসা عليه السلام ফেরাউনের নিকট এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও মক্কা ও অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াতই পেশ করেছেন ; তাদেরকে গদি পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাননি। তবুও প্রত্যেক রাসূলের সঙ্গেই কায়েমি নেতৃত্বের সংঘর্ষ বেধেছে । প্রচলিত সমাজের নেতৃবৃন্দ কোনোকালেই ইসলামের আহ্বান গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

কেননা, তাদের পার্থিব যাবতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। তবুও নবীগণ ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম নেতাদের নিকটই পেশ করেছেন। প্রত্যেক রাসূলই সমাজের নেতৃস্থানীয় যাদের নিকট দাওয়াত পেশ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। সেখানে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজপতিগণ প্রত্যেক রাসূলেরই বিরোধিতা করেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, উপায় উপকরণের পবিত্রতা : তিনি কোন অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দুশমনদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশও পোষণ করতেন না। কঠিন রাজনৈতিক শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হতো তাহলে তিনি পূর্বের সব দোষ মাফ করে দিতেন।

তাঁর রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো উদ্দেশ্যের পবিত্রতা। ইসলামকে প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য ছিল। নিজে ক্ষমতা দখল করা যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে আন্দোলনের শুরুতেই তিনি মক্কার নেতৃত্বের প্রস্তাব মেনে নিয়ে রাজা/বাদশাহ হতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

www.QuranerAlo.com

Contents

৬. আন্তর্জাতিক জীবনে আদর্শ : মহানবী ﷺ এর আন্তর্জাতিক নীতির মূল কথা ছিল বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বই সারা বিশ্বের মানুষকে একই সুতায় গ্রন্থিত করতে সক্ষম। ভাষা, বর্ণ, পেশাগত ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তা মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ। সকল মানুষই এক সম্প্রদায়-ভূক্ত। আদি পিতা আদম عليه السلام থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা অযৌক্তিক। কেননা একমাত্র তাকওয়ার (আল্লাহ-ভীতির) ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। ঐক্যের এ মূলনীতির ভিত্তিতে মহানবী ﷺ পারস্পরিক সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিভক্ত আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন : "হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ বলেছেন, **"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।"** [সূরা হুজুরাত ৪৯: ১৩] *"ইসলামে জাতি ও শ্রেণিভেদ ও বৈষম্য নেই। আরবের ওপর অনারবের কিংবা অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার উপর কালোর কিংবা কালোর উপর সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদার ভিত্তি হলো কেবল তাকওয়া (আল্লাহভীতি)।"*[৫৩]

এ হলো নবী ﷺ এর আন্তর্জাতিক নীতি। এ নীতিই পারে আন্তর্জাতিক বিশ্বে শান্তি দিতে।

৭. শিক্ষা জীবনে আদর্শ : শিক্ষা ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ যে পথ দেখিয়েছেন ইতিহাসের পাতায় তা বিরল। বিশেষ করে জ্ঞান- বিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন "*(দ্বীনি) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয*" আবার এ জ্ঞানার্জনের জন্য উত্তম প্রতিদানের কথাও বলেছেন। তাঁর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছিল তাও ছিল **"পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"**। [সূরা আল আ'লাক ৯৬ : ১]

তিনি ছিলেন জ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধের বন্দিদের শিক্ষার বিনিময় মুক্ত করে দেন। তাঁর জামানায় রাষ্ট্রীয়ভাবে লেখার কাজে ৫০ জন লেখক নিয়োজিত ছিল। মহানবী ﷺ এর হিজরতের পর মসজিদে নববী কেন্দ্রীক "সুফফা" প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পৃথিবীর ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছেন।

৮. বিচার ব্যবস্থায় আদর্শ : Might is Right - "জোর যার মুল্লুক তার" এ বিশ্বাসের সমাজে বিচার ব্যবস্থা বলতে কোনো কিছুই ছিল না। সে সময় রাসূল ﷺ ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করে আমাদের ন্যায় বিচারের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক বিচার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে।"** [সূরা আন নিসা ৪ : ৫৮]

---

৫৩ সিরাতুন-নবী ২/৪৩৬ , আল-বায়ান ওয়াত-তাবিঈন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২৯

www.QuranerAlo.com

মদিনা নামক মডেল রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর ।"** [সূরা আল মায়িদাহ ৫ : ৪৮]
তাঁর বিচারব্যবস্থায় ছিল না কোন দলীয়-পক্ষপাত, আত্মীয়প্রীতি, স্বজনপ্রীতি। তিনি ছিলেন সকল মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। একদা এক মহিলাকে চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দিলে, মহিলার বংশ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে কিছু সাহাবী হাত না কাটার সুপারিশ করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন, *"তোমরা জেনে রাখ মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি আজ চুরি করত তাহলে তার হাতও কেটে ফেলতাম।"*[৫৪]

৯. জিহাদ ও প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠায় আদর্শ : ইসলামে জিহাদ ফরজ বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **"এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেননা ।"** [সূরা বাকারাহ ২ : ১৯০]
মহানবী ﷺ এর ২৩ বছরের নবুয়তী জিন্দেগিতে অনেকগুলো যুদ্ধ করেছেন। সরাসরি ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর এ সকল যুদ্ধ ছিল মানবতার মুক্তির জন্য সত্য দ্বীন (ধর্ম) ইসলাম প্রচার ও কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করার জন্য। তায়েফের ময়দানসহ শত শত ঘটনা তাঁর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের কঠিন মুহূর্ত হলো যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ সেখানেও তিনি ছিলেন মানবতার কল্যাণে মগ্ন। হিংসা বিদ্বেষ কোনো কিছুই তাঁকে উত্তেজিত করতে পারেনি। আধিপত্য বিস্তার, রাজ্য দখল তাঁর মূলনীতি ছিল না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার মুক্তির জন্য সঠিক দ্বীন (ধর্ম) ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। মুসলিম মুজাহিদ-সেনাবাহিনীর প্রতি তার নির্দেশ ছিল যে, *"কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না। গণিমতের মাল আত্মসাৎ করবে না।"* মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নির্দেশ দেন, *"আহত ব্যক্তির উপর হামলা চালাবে না। পলায়নরত ব্যক্তির পিছু ছুটবে না, যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলবে না।"* তিনি আরও বলেন *"সন্ন্যাসীদের (পাদ্রী/যাজকদের) কষ্ট দিবে না এবং তাদের উপাসনালয় ভাঙবে না, ফলের বাগান, গাছ ও ফসল নষ্ট করবে না।"*
আলেকজান্ডার পাওয়েল বলেন: *'কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের পর মুসলিমগণ যে পরিমাণে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন তা খ্রিস্টান জাতিসমূহকে লজ্জিত করে।'*
সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন অতুলনীয়। বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মুসলিম দেশসমূহে নির্বিচারে বোমা হামলা চালাচ্ছে, গণহারে মুসলিম নারী ও শিশুদের হত্যা করছে তাদের জন্য নবীজির জিহাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অবদানে অনেক কিছু শিক্ষনীয় রয়েছে।

উপসংহার : আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে অশান্তি ও

---

৫৪ সহিহ বুখারি হা নং ৩৪৭৫

www.QuranerAlo.com

বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো মহানবী ﷺ মানুষের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করা। তাঁর অনুসারীরা তাঁর এ আদর্শকে ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন করে একটি সোনালী সমাজের ভিত নির্মাণ করেছেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়ে যাওয়ার পরেও আজকের সমাজ ও সভ্যতা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা মুহাম্মাদ ﷺ এর অবদান। তাই আজকে প্রয়োজন তাঁকে আমাদের আদর্শ হিসেবে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া। পরিশেষে জর্জ বার্নাড'শ এর Getting Married গ্রন্থের লিখিত উক্তি দিয়ে লেখা সমাপ্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন, *'যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোনো নায়কের শাসনাধীনে আনা হত তা এক মাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ই সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।'*

অতএব বিনা দ্বিধায় আমরা বলতে পারি যে
মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের একমাত্র আদর্শ মানব।

www.QuranerAlo.com

মুহাম্মাদ ﷺ ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআ'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।" [সূরা মায়িদা ৫: ৩]

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে শেষ নবী বলে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- **"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।' আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"** [সূরা আল-আহযাব ঃ আয়াত: ৩৩ : ৪০]

তেমনি নবী করীম ﷺ এর অসংখ্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন, তাঁর পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আগমন করবেন না। আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, " *আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন?* নবী *করীম ﷺ বলেন বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবী।*'[৫৫]

উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো– মুহাম্মাদ ﷺ ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না ।

অমুসলিমদের চোখে নবী মুহাম্মাদ ﷺ

আমরা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উম্মত (অনুসারী)। তিনি কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য নবী। অমুসলিমরা নবীজীর মানবীয় গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত লেখায় তাদেরই দুইজনের কিছু অনুভূতি তুলে ধরছি।

- ভারতের বিখ্যাত লেখক গুরুদত্ত সিং নবীজীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা জানিয়েছেন এভাবে----"*সত্যের আলো ছড়াতে, পুণ্যের পথ দেখাতে এক মহামানবের আবির্ভাব হল। তাঁর শুভদর্শনে দৃষ্টি যাদের প্রেমমুগ্ধ হল এবং হৃদয় যাদের ভালবাসায় স্নিগ্ধ হল জনম তাদের সার্থক হল। এ পরশমণির পরশ-সৌভাগ্য যারা লাভ করল খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি তারা হল। এ স্বর্গ-পুষ্পের সান্নিধ্য-সৌরভ যারা পেল বিশ্ববাগানে তারা গোলাপের খোশবু ছড়াল।*"
- ফিলিপ কে হিট্টি ছিলেন বড় বিজ্ঞানী। তিনি বলেন,"উত্তম *চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার দ্বারা তিনি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। সব সময় তিনি ন্যায়ের পথে*

---

৫৫ সহিহ বুখারি হা; নং ৩৫৩৫ ।

www.QuranerAlo.com

চলেছেন। কখনো কোনো অন্যায় করেননি এবং ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। যারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, যারা তাঁকে দেশছাড়া করেছিল তাদেরও তিনি ক্ষমা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কোনো প্রতিশোধ নেননি।'[৫৬]

নবীজির ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ

মহানবী ﷺ ১০ম হিজরীতে হজ্জ পালন করেন। এটাই ছিল তার জীবনের শেষ হজ্জ। ইসলামের ইতিহাসে এটি বিদায়ী হজ্জ হিসেবে খ্যাত। সেবার ৯ জিলহজ্জ, শুক্রবার দুপুরের পর আরাফার ময়দানে সমবেত লাখো সাহাবীর উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন।

নবীজির ভাষণটির অনুবাদ:

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার পর মহানবী ﷺ বলেন,*"আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত) ইলাহ (উপাস্য) নেই। তার কোন সমকক্ষ নেই।*

আল্লাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন। আর তিনি একাই বাতিল শক্তিগুলো পরাভূত করেছেন।

.......হে আল্লাহর বান্দারা, আমি তোমাদের আল্লাহর 'ইবাদত' ও তার বন্দেগীর ওসিয়ত এবং এর নির্দেশ দিচ্ছি। হে লোকসকল, তোমরা আমার কথা শোনো। এরপর এই স্থানে তোমাদের সাথে আর একত্রিত হতে পারব কি না জানি না।[৫৭]

.......হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ বলেছেন, **"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।"** [সূরা হুজুরাত ৪৯: ১৩]

ইসলামে কোন শ্রেণিভেদ ও বৈষম্য নেই। আরবের ওপর অনারবের কিংবা অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার উপর কালোর কিংবা কালোর উপর সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদার ভিত্তি হলো কেবল তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি)।[৫৮]

.......হে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা দুনিয়ার বোঝা নিজের কাধেঁ চাপিয়ে যেন আল্লাহর সামনে হাজির না হও । আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো উপকারই করতে পারব না।

.......শুনে রাখো, সকল জাহিলী বিষয় ও প্রথা আজ আমার পায়ের নিচে। জাহেলী যুগের রক্তের দাবি রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার গোত্রের রক্তের অর্থাৎ রবী'আ ইবনুল হারিসের পুত্রের রক্তের দাবি রহিত ঘোষণা করছি। বনু সা'দ গোত্রে থাকাকালে হুযাইলীরা তাকে হত্যা করেছিল। জাহিলী যুগের সুদও রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার গোত্রের দাবি অর্থ্যাৎ চাচা আব্বাসের সুদ মাফ করে দিলাম। সুতরাং সকল সুদ আজ রহিত করা হলো।

---

৫৬ সূত্র: মাসিক আল-কাওসার http://www.alkawsar.com/article/199

৫৭ ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ৬০৩ পৃ: ।

৫৮ সিরাতুন-নবী ২/৪৩৬, আল-বায়ান ওয়াত-তাবিঈন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২২৯

www.QuranerAlo.com

Contents

......হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের সম্পদ পরস্পরের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম (পবিত্র ও নিরাপদ) করা হলো, যেমন আজকের এই দিন, আজকের এই মাস, তোমাদের এই শহর, সকলের জন্য হারাম (পবিত্র ও নিরাপদ) । তোমরা শিগ্রই আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। তিনি তোমাদের সকলকেই তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।[৫৯]

......জেনে রাখো, অপরাধীর দায়িত্ব কেবল তার কাঁধেই বর্তায়, পিতা তার পুত্রের জন্য এবং পুত্র তার পিতার অপরাধের জন্য দায়ী নয়।[৬০]

......হে লোকসকল, নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। এদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার সময় আল্লাহর দন্ড সম্পকে ভয় রেখো। কেননা, তাদের তোমরা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ আল্লাহর আমানাহ স্বরূপ এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। জেনে রাখো, তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের প্রতিও তাদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের কল্যাণ সাধনের বিষয়ে তোমরা আমার নসীহত গ্রহণ করো।[৬১]

......তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের (চাকর-চাকরানী, দাস-দাসী) সম্পর্কে সতর্ক হও। নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে: নিজেরা যা পরবে, তাদেরও পরাবে।

......যে ব্যক্তি নিজের পিতার স্থলে অপরকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, নিজের মাওলা বা অভিভাবক বলে পরিচয় দেয়, তার ওপর আল্লাহর লা'নত। ঋণ অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক আমানাত তার হকদারের নিকট অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। কারও সম্পত্তি সে যদি সেচ্ছায় না দেয়, তবে তা অপর কারও জন্য হালাল নয়। সূতরাং তোমরা একজন অপরজনের ওপর যুলম করবে না। এমনিভাবে কোনো স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সম্পত্তির কোনো কিছু তার সম্মতি ব্যতিরেকে কাউকে দেওয়া হালাল নয়। যদি কোন নাক-কান কাটা হাবশি দাসকেও তোমাদের আমীর বানিয়ে দেয়া হয়, তবে সে যতদিন আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবে, ততদিন অবশ্যই তার কথা মানবে, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শণ করবে।

......হে লোকসকল, আমার পরে আর কোন নবী নেই, আর তোমাদের পরে আর কোন উম্মতও নেই। শোনো, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথারীতি আদায় করবে, রমাদানে সিয়াম (রোজা) পালন করবে, স্বতঃফূর্ত ও খুশি মনে তোমাদের সম্পদের যাকাত দেবে, তোমাদের রবের ঘর বায়তুল্লাহতে হজ্জ পালন করবে আর আমীরের আনুগত্য করবে; তা হলে তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।[৬২]

......আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ (হাদীছ)।[৬৩]

---

৫৯ সহীহ মুসলিম হাদিস নং ১২১৮, হুজ্জাতুল নবী (নবীর হজ্জের অধ্যায়) ১ম খন্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা ।
৬০ ইবনু মাজাহ ২৬৬১,২৬৭০, হজ্জ পর্ব, মিশকাত ১ম খন্ড ২৩৪ পৃ:
৬১ সহীহ মুসলিম, হুজ্জাতুল নবী (নবীর হজ্জের অধ্যায়) ১ম খন্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা ।
৬২ ইবনু মাজাহ, ইবনু আসাকের, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খন্ড ২২৩ পৃ:
৬৩ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ১৮৭৪, মিশকাত ১৮৬, সিলসিলা সহীহাহ ১৭৬১।

www.QuranerAlo.com

.......তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে।

.......এই ভূমিতে আবার শয়তানের পূজা হবে-- এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু ছোট ছোট বিষয়ে তোমরা তার অনুসরণে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এতে সে সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে শয়তান থেকে সাবধান থেকো। শোনো, তোমরা যারা উপস্থিত আছ, যারা অনুপস্থিত, তাদের কাছে আমার বাণী পৌছে দিয়ো। অনেক সময় দেখা যায়, যার কাছে পৌছানো হয়, সে পৌছানেওয়ালার তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী হয়।[৬৪]

.......তোমাদের আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে?

সমবেত সকলে সমস্বরে উত্তর দিলেন; 'আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি নিশ্চয় আপনার ওপর অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং সকলকে নসীহত করেছেন' ।

[রাসুলুল্লাহ ﷺ আকাশের দিকে পবিত্র শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে আবার নিচে মানুষের দিকে নামালেন আর বললেন -- হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।

হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।] [৬৫]

বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর মুহাম্মাদ ﷺ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং কিছুদিন পর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ১১ হিজরী ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।[৬৬] মৃত্যুর সময় নবীজীর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

সপ্তম অধ্যায়ঃ

কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি ইসলামের নীতি

কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি ইসলামের নীতির অনেক বাস্তব উদাহরণ আছে তার মধ্যে সংক্ষেপে ১টি ঘটনা উল্লেখ করলাম:

- *আনাস ﷺ বলেন, একটি ইয়াহূদী বালক রাসূল ﷺ-এর সেবা করত। সে তাঁর ওযূর পানি এনে দিত ও জুতা গুছিয়ে দিত। একসময় সে পীড়িত হ'ল। রাসূল ﷺ তার বাড়ীতে তাকে দেখতে গেলেন ও মাথার কাছে বসলেন। অতঃপর ছেলেটিকে বললেন, 'তুমি ইসলাম কবুল কর' । ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল। বাপ তাকে বলল, 'তুমি আবুল ক্বাসেম (রাসুল ﷺ এর আর এক নাম)-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি "কালেমা শাহাদাত" পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল ﷺ বের হবার সময় বললেন 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।*[৬৭]

৬৪ সহীহ বুখারি মিনার ভাষণ ১ম অধ্যায়- পৃ: ২৩৪ ।

৬৫ সহীহ মুসলিম হাদিস নং ১২১৮, হুজ্জাতুল নবী (নবীর হজ্জের অধ্যায়) ১ম খন্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা ।

৬৬ দেখুন: সুহাইলি প্রণীত "আর-রওদুল উনফ (৪/৪৩৯-৪৪০), ইবনে কাছিরের "আস-সিরাহ আন-নববিয়াহ" (৪/৫০৯), ইবনে হাজারের "ফাতহুল বারি" (৮/১৩০)।

৬৭ আবুদাউদ হা/৩০৯৫; আহমাদ হা/১৩৩৭৫; সহিহ ইবনে হিবক্ষান ৪৮৮৪।

www.QuranerAlo.com

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, নিজের বাড়ীর কাজের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ কখনো তাকে বা তার ইয়াহূদী পরিবারকে ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি।

এরূপ অসংখ্য নযীর ইসলামের ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে অন্য ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ পায় অথচ কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে মুসলিমদের প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। সেখানে মুসলিমদের গরু কুরবানী করতে বা মাইকে আযান দিতে, এমনকি একের অধিক সন্তান নিতেও নিষেধ করা হয়। মিথ্যা অজুহাতে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয় ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করা হয়। অতএব 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'এর অর্থ সব ধর্মের স্বাধীনতা নয় বা অসাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ হ'ল ইসলামকে প্রতিহত করা। মুসলিম বাদে অন্য ধর্মের লোকদের স্বাধীনতা। ভারত, কাশ্মীর, আরাকান (বার্মা).সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

কাফির (অবিশ্বাসী) মাতা-পিতার প্রতি আচরণ

সন্তানের ইসলাম গ্রহণ করার পরও যদি মাতা-পিতা কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং সন্তানকে কুফরিতে ফিরে আসতে বাধ্য করে, তবে কোনোক্রমেই সেই মাতা-পিতার কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা আল্লাহর নাফরামানিমূলক কাজে কোনো মানুষের আনুগত্য করা হালাল (বৈধ) নয়। তবে অবশ্যই মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সদাচারণ করে যেতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, **"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।"** [সূরা লুকমান ৩১ : ১৫]

মাতা-পিতা সন্তানকে কুফরি করার জন্য যত কঠিন চাপ প্রয়োগ করুক না কেন, তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে তাদের সঙ্গে অবশ্যই সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করে যেতে হবে।

আবু হুরাইরা ﵁ মুসলিম হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি তার মাকে সর্বদা শিরকের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। আর তাঁর মাও সর্বদা অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন।

- আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, *"একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা শুনালেন, যাতে আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুলের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, তিনি সব সময় তা অস্বীকার করতে থাকেন। আজ আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাগান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবি করে*

www.QuranerAlo.com

বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ করেন। আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আপনি আল্লাহর দরবারে দুআ করুন, যেন তিনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন : হে আল্লাহ! আপনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়াত করুন। আমি রাসূলুল্লাহের দুআর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বাড়ি পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে বললেন, আবু হুরাইরা অপেক্ষা কর।

তিনি তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে ওড়না পরা ছাড়াই দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন, আবু হুরাইরা! "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো (প্রকৃত) ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসুল।" আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুলুল্লাহের খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তাআলা আপনার দুআ কবুল করেছেন। তিনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেছেন। একথা শুনে তিনি খুশি হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং আমাকে নসীহত করলেন।

এরপর আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি দুআ করুন যেন আল্লাহ আমাকে ও আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন : ইয়া আল্লাহ! আবু হুরাইরা ও তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন। এ দুআর পর যে মুসলিমই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালোবেসেছে ।[৬৮]

সুবহান-আল্লাহ কত সুন্দর দৃষ্টান্ত!

সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম !

জগতের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে একমাত্র ইসলাম ।

- মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- শিশু ও ইয়াতিমদের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- পিতামাতার অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- দাস-দাসীর অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম
- এমনকি জীব-জন্তু পশুপাখির অধিকারও নিশ্চিত করেছে ইসলাম

৬৮ সহীহ মুসলিম হাদিস নং ২৪৯১

www.QuranerAlo.com

আপনি জানেন কি? রুহের জগতে সকল মানুষই আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল ?

জী, হ্যা, পৃথিবীর সকল মানুষ (সকল ধর্মের) সৃষ্টির আদি থেকে কেয়ামত (পৃথিবীর ধ্বংস) পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা সবাই আল্লাহকে রুহের (আত্মার) জগতে রব (পালনকর্তা) হিসেবে মেনে নিয়েছে। প্রমাণ কি? তার প্রমাণ নিচে উল্লেখ করলাম ।

আহদে আলাস্তু [প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার] ৬৯

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব কিছু সৃষ্টির সময়ই অর্থাৎ রুহ (আত্মা) সমূহ সৃষ্টির পর পরই সব কিছুর জন্য প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছেন। কারও অস্বীকার করার কোনই উপায় নাই। কেয়ামত অবধি যা কিছু ঘটবে সব কিছুর জন্য সকল রুহের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছেন। আসুন, আমরা বিষয়টি কুরআনের আলোকে জানি।

আহদে আলাস্তু'র উদ্দেশ্য কি তা কুরআনের (৭) নং সুরা আল-আরাফ-এর ১৭২-১৭৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

- **"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।'** (এটা এজন্য করা হয়েছিল) **যাতে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'।"** [সুরা আল-আরাফ ৭ ঃ ১৭২]
- **"অথবা তোমরা এ কথা না বল যে, 'পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই শিরক করেছে আর তাদের পরে আমরা তাদেরই সন্তানাদি** (যা করতে দেখেছি তাই করছি) **তাহলে ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা যা করেছে তার জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?"** [সুরা আল-আরাফ ৭ ঃ ১৭৩]
- **"এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, আর হয়ত তারা** (আমার পথে) **ফিরে আসবে।"** [সুরা আল-আরাফঃ ৭ ঃ ১৭৪]

পবিত্র কুরআনের (৭) নং সুরা আল-আরাফ-এর ১৭২-১৭৪ নং আয়াতের বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, ঐ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার ছিল দুই ধরনের।

১) আদিকাল ঘটিত প্রতিজ্ঞা এবং

২) অহির বিধানের আনুগত্য করার জাগতিক প্রতিজ্ঞা যা প্রত্যেক নবীর আমলে তার উম্মতগনের উপরে ছিল অপরিহার্য।

আহদে আলাস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন ---

(১) সকল আদম সন্তানের (সকল ধর্মের মানুষদের) কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

---

৬৯ সংকলন ও সম্পাদনা - শাকিল তালুকদার ।

সকল আদম সন্তানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়ার পর-

(২) নবী-রাসুলদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তারপর-

(৩) উম্মতগনের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

- "স্মরণ কর, আমি যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আর তোমার কাছ থেকেও; আর নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা আর মারইয়াম পুত্র 'ঈসা থেকেও। আমি তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার " [সুরা আহযাব ৩৩ ঃ ৭]

ঐ রুহ গুলোর মধ্যে ঈসা ﷺ রুহ ছিল, যা মারিয়ামের কাছে পাঠানো হয়। উবাই ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যেঃ *"ঐ রুহ মারিয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে।"*[৭০]

(৪) শেষ নবীর জন্য প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) ঃ

শেষ নবীর জন্য প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) নিয়েছেন এইভাবেঃ

- "স্মরণ কর, যখন মারইয়ামের পুত্র 'ঈসা বলেছিল, 'হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম 'আহমাদ।' অতঃপর সে [অর্থাৎ 'ঈসা ﷺ যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন সেই নবী অর্থ্যাত মুহাম্মাদ সা.] যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'এটা তো স্পষ্ট যাদু।" [সুরা আস-সফ ঃ ৬১ ঃ ৬]

(৫) ইহুদি আলেমদের (পন্ডিতদের) থেকে প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) ঃ

উপরের ওয়াদা ছাড়াও ইহুদি-নাসারা পন্ডিতদের কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) নেওয়া হয়, যাতে তারা সত্য গোপন না করে। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

- "(স্মরণ কর) আল্লাহ আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন- তোমরা অবশ্যই তা (অর্থাৎ কিতাব) মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে আর তা গোপন করবে না, কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করল এবং সামান্য মূল্যে বিক্রি করল, তারা যা ক্রয় করল সে বস্তু কতই না মন্দ!" [সুরা আল-ইমরানঃ ৩ ঃ ১৮৭]

(৬) সাধারন বনু ঈসরাইলগনের থেকে প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) ঃ

অতঃপর বনু ইসরাইলদের সাধারন লোকদের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) নেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

- "যখন বানী ইসরাঈলের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামায কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।" [সুরা আল-বাকারাহঃ ২ ঃ ৮৩]

---

৭০ মিশকাতঃ হাদিস নং ১২২ , আহমাদ খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠা ১৫৬।

www.QuranerAlo.com

বলা বাহুল্য অধিকাংশ নবীই বনু ঈসরাইল থেকে এসেছেন। কিন্তু বনু ইসরাঈলিরা অধিকাংশ নবীকে হত্যা করেছে ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; তাদের আসমানী কিতাবসমুহকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে, তাদের নবীদের চরিত্র হনন করেছে, তাদের নামে কলংক লেপন করেছে এবং অবশেষে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে পেরেও না চেনার ভান করেছে ও তার সংগে চূড়ান্ত গাদ্দারী করেছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন----

- **"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সে রকমই চিনে, যেমন চিনে নিজের পুত্রদেরকে, আর ওদের কতকলোক জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে থাকে। "** [সুরা বাকারাহ ঃ ২ ঃ ১৪৬]

অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকে ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন এবং আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা পুরন করেছিলেন।

যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

- **"আর যখন তাদের নিকট তা তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয় তা সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম "**। [সুরা কাসাসঃ ২৮ ঃ ৫৩]

পরকালের মুক্তির জন্য কি ইসলাম গ্রহনের প্রয়োজন আছে?

হ্যা, অবশ্যই পরকালের মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজন আছে। ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ধারণা, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী সমূহ উল্লেখ করেছি যাতে প্রমাণিত হয় অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। আর এই সত্য দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ না করলে সবাই আখিরাতে (পরকালে) ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যেহেতু পরকালের (মৃত্যুর পরের) জীবনই চিরস্থায়ী। তাই সর্বক্ষেত্রে পরকালকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ । যেহেতু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে ইসলামই একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম। তাই ইসলাম ছাড়া মুক্তির আর কোন উপায় (পথ) নেই ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ

পথভোলা মানুষদের ইসলামের পথে ফিরে আসার সত্য ঘটনা

কাছে আসার গল্পতো অনেক শুনেছেন তাইনা? আসুন এবার ইসলামে আসার গল্প ও না বলা হৃদয়বিদারক বাস্তব কাহিনী শুনি। এখানে আমি বর্ণনা করতে চাচ্ছি সেসব লোকদের হৃদয়বিদারক গল্প যারা ভুল পথে ছিল এবং যখন বুঝতে পারল ইসলামই সঠিক দ্বীন (ধর্ম) তখন তারা ইসলামে ফিরে এসেছিল । আশা করি গল্পগুলো আপনার হৃদয়ে সাড়া জাগাবে ।

একজন নাস্তিকের ইসলামে ফিরে আসার বাস্তব কাহিনী

"না কখনোই না, আমি কোনদিন মুসলিম হবো না"– কট্টর নাস্তিক ব্লুবেনের সোজা জবাব ছিলো, মুসলিমরা জঙ্গী (সন্ত্রাসী), ওই ধর্মকে গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই আসেনা।

........অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ব্লুবেন জানান, তার পিতামাতা তাকে শিখিয়েছেন আমরা প্রাকৃতিক নিয়মে জন্ম নিয়েছি, এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি প্রাকৃতিক ভাবেই ছিল আর প্রাকৃতিক ভাবেই থাকবে। প্রকৃতি নিজেকে স্রষ্টা দাবি করেনা, এমনি এমনিই নিয়মগুলি হয়েছে, এমনি এমনিই পানি থেকে জীবন এসেছে, এতে কোনো স্রষ্টা লাগেনি, তাই স্রষ্টা নেই। আবার একদিন আমরা এমনি এমনিই মরে যাবো, প্রকৃতির অংশ হয়ে যাবো মরার পরে কোনো জবাবদিহিতা (হিসাব-নিকাশ) নেই এসব বাজে কথা (অলীক-কল্পনামাত্র)।

বাবাকে বললাম, চাঁদে পানি থাকবেনা কিন্তু পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ পানি থাকবে, অথচ সবগুলিই গ্রহ-উপগ্রহ। আবার বিমান দুর্ঘটনায় সবাই মরে যায়, একটা শিশু বেঁচে থাকে, অথচ সবাই বাঁচতে চেয়েছিলো। এটা প্রকৃতি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় আর কে তা ডিজাইন করে ? বাবা বললেন এমনি এমনিই হয় । (আজবতো ! মানতে পারা যায়?)

........বাবার কথায় আমি কট্টর নাস্তিক ছোটবেলা থেকে। ঈশ্বর (স্রষ্টা) বিহীন জগতে বাবাকে ঈশ্বরের (স্রষ্টার) মত ভাবতাম, কিন্তু তিনি আমার মাকে ছেড়ে চলে গেলেন, প্রথম ধাক্কা খেলাম জীবনে, এটাও কি এমনি এমনি প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহলে আমার বন্ধুর পিতা মাতা এত সুখী কেন ?

........মাত্র ১৮ বছর বয়সে আমার সেই বন্ধুটিও এমনি এমনিই মরে গেলো, কি আশ্চর্য মৃত্যু! মনে হলো বেড়ে দেয়া গরম ভাত দুই মিনিটে ঠান্ডা হয়ে গেছে, তার জীবনটা সে শুরুই করতে পারেনি, এমনি এমনি এত সহজে প্রকৃতি তাকে নিয়ে গেলো ? ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির ফর্মুলার মতো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন

Contents

মিলালে যদি পানি হয়, মানুষের জীবন কেন একই ধরনের প্রাকৃতিক ফর্মুলায় চলেনা ?

কেউ ধনী অথচ অসুখী আর কেউ গরীব অথচ সুখী, কিন্তু ফর্মুলা অনুযায়ী সব ধনীর সুখী থাকার কথা। পদার্থের ফর্মুলার জগত আর মানুষের ফর্মুলার জগতে পার্থক্য কেন ? এমনি এমনি ? এই প্রকৃতির মাঝে একটা কন্ট্রোল রুম না থাকলে এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

........কোনো জবাব নেই আমার কাছে- কেন আমি, কে আমি, কোথায় আমি? প্রকৃতির সব প্রাণী একরকম, মানুষ শুধু অন্যরকম, এটি কি এমনি এমনি হয়েছে ? ড্রিংকস করতে শুরু করলাম, পুলিশেও ধরলো। একজন তরুণের জীবনের কঠিন হতাশা আমাকে চেপে ধরলো।

.........মৃত বন্ধুটির কথা প্রায়ই মনে হতো। ভাবতাম আমি যদি কাল ওর মতই মরে যাই তাহলে কি হবে ? কিছুই না! সাত বিলিয়ন লোকের পৃথিবীতে আমার পরিচিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র জানবে ছেলেটি মরে গেছে। কিন্তু মানব জীবন কি কুকুর বিড়ালের মৃত্যুর মতো এতই ছোট, এতই অর্থহীন, উদ্দেশ্য বিহীন হতে পারে ? আমার অস্তিত্বের মধ্যে এক আজব শূন্যতা অনুভব করতে শুরু করলাম। তখন মনে হলো বাবার শেখানো প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অবশ্যই মানুষের জন্যে কিছু একটা আছে, থাকতেই হবে। তা না হলে মানুষেরা আলাদা কেন ? শুধু মানুষকে যা খুশী ভাবার বুদ্ধি আর যুক্তি বোঝার মন দেয়া হলো কেন ?

........মনে হলো মানুষের এই অসহায় শুন্যতা পূরণের জন্যে হয়তো ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। আমার অসহায়ত্ব আর একাকীত্ব ঘুচানোর জন্যে ভাবলাম ধর্মকে ব্যবহার করে দেখি।

........অস্ট্রেলিয়ান হিসাবে সোজা খ্রিস্টধর্মকেই ধরলাম। ভাবলাম গাড়ির কাঁচে স্টিকার লাগাবো, I Love Jesus 'আই লাভ যিশুস' তারপরে নিষিদ্ধ জায়গায় পার্কিং করে জরিমানা না খেলে ভাববো ঈশ্বর (স্রষ্টা) আছেন। খ্রিস্ট ধর্মের সব গ্রুপের বিশ্বাস নিয়ে পড়াশুনা করলাম,পন্ডিতদের সাথে বসলাম-আমার জবাব মিললোনা, তাদের কথাবার্তা ভালো ছিলো, কিন্তু মনে হয়নি তারা আমার শুন্যতা পূরণের উপযোগী ধর্মের কথা বলছেন।

অবাক লাগলো, ঈশ্বর (স্রষ্টা) তার অলৌকিক সন্তানকে (যিশুকে) দুনিয়াতে পাঠিয়ে অসহায় ভাবে তার পুত্রকে ক্রুসিফাই (ক্রুশবিদ্ধ) করালেন, তাতে বাকি সবাই পাপমুক্ত হয়ে গেলো। আবার পবিত্র আত্মার উপস্থিতি পিতা পুত্রের মাঝখানে, সবাই ঈশ্বর (স্রষ্টা) পার্টনার। ঈশ্বর (স্রষ্টা) একাই তো যথেষ্ঠ হওয়া উচিত, যদি উনি (প্রকৃত) ঈশ্বর (স্রষ্টা) হয়ে থাকেন। ঈশ্বর (স্রষ্টা) কেন আমার বাবার মতো সংসার পেতে বসবেন আর তার পুত্রকে (যিশুকে) অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে ,তখন চুপ করে দেখবেন, যৌক্তিক লাগলো না। মনে হলো অযৌক্তিক কথা-বার্তার কারণেই গীর্জাগামীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

Contents

........হিন্দু ধর্ম দেখলাম। আমার কাজের জায়গায় হিন্দু সহকর্মীরা ছিলো, আমরা ধর্ম নিয়ে সারাক্ষণ কথা বলতাম । আমি ঝগড়া করতামনা কারণ ওরা ভালো বন্ধুও ছিলো। ওরা বলতো তোমার সম্পদের ব্যাপারে একজন দেবতাকে (স্রষ্টাকে) বিশ্বাস করতে হবে, আবার বিদ্যার ব্যাপারে আর একজন দেবতাকে (স্রষ্টাকে), এভাবে সব প্রয়োজনের জন্যে আলাদা আলাদা দেবতাকে (স্রষ্টাকে) বিশ্বাস করতে হবে। আমি তখন বলতাম (Come On Man) কাম অন ম্যান, দেবতাদের (স্রষ্টাদের) নিজেদের মধ্যে যদি তর্ক লেগে যায়, তখন কি হবে ?

ইহুদী ধর্ম দেখলাম, নতুন কিছু পেলাম না। বুদ্ধকে ভালো লাগলো। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ নিজের সম্মন্ধে যা বলেছেন তাতে একজন প্রেরিত পুরুষের (তথা নবী-রাসূলের) মত কোনো কথা নেই। আমার যে মৌলিক প্রশ্ন, 'আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি ?'- তার কোনো জবাব পেলামনা এই ধর্মে, অথচ অনেক ভালো ভালো উপদেশাবলী আছে।

........তখন আমার এক খ্রিস্টান বন্ধু বলল, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দেখো ।

না, ওরা তো সন্ত্রাসী! আমি কোনো মসজিদের ধারে কাছে যাবো না, কখনো-ই না। কিন্তু কদিন পরে আমি কেন জানিনা প্রেস্টন এলাকার মসজিদের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। মসজিদে ঢুকে পড়লাম পায়ের জুতো না খুলেই। এ সময় এক ব্যক্তি সালাত (নামাজ) পড়ছিলেন ও সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। আমি সরাসরি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। আমি তার সালাত (নামায) পড়ার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এ অবস্থায় মসজিদের আলেম আবু হামজাহ হাসিমুখে আমাকে স্বাগত জানাতে এলেন ও তার কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে আমি স্রষ্টা ও ইসলাম সম্পর্কে যখন নানা প্রশ্ন করছিলাম তখন তিনি জবাব দিচ্ছিলেন শুধু কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে।

........এরপর যতবারই আমি যাকেই প্রশ্ন করেছি কেউ তার মন থেকে নিজস্ব কোনো জবাব দেয়নি, সবাই আমার হাতে কুরআন ধরিয়ে বলত এই দেখো তোমার প্রশ্নের উত্তর---আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন। অথচ আমি যখন পাদ্রী-পুরোহীতদের কাছে যেতাম বাইবেল দেখিনি কখনো। তারা তাদের নিজস্ব যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। দু-একজন দু-একবার বাইবেল পড়ে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন অবশ্য। কিন্তু প্রতিটি মসজিদে আমি যখনই প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছি, জবাবে তারা কুরআন নিয়ে এসেছেন ।

........আমি পরিষ্কার বুঝে গেলাম, ইসলাম ধর্মকে তার অনুসারীদের প্রশ্নবোধক কার্য্যকলাপ দেখে বোঝা যাবেনা। ইসলাম আসলে একটি গাইড বই, যে এটি অনুসরণ করছে ঠিকঠাক সে ইসলামে ঢুকে গেছে, তার নাম হয় মুসলিম। আর যে অনুসরণ করছেনা তার নাম আর পাসপোর্টে মুসলিম লেখা থাকলেও আসলে প্রকৃত পক্ষে সে মুসলিম নয় ।

........এই সত্য অনুধাবন করার পর আমি কুরআন পড়তে শুরু করি, ৬-৭ মাস অধ্যয়ন করার পর আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন হাজির হয়, তখন আমার বয়স ২০। এইরকম বয়সে আমি কিভাবে মুসলিম হলাম, সে এক অদ্ভুত হাস্যকর কাহিনী।

........একদিন রাতে আমার কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু বড় অক্ষরে ছাপানো এক খন্ড কুরআনুল কারিম দিলো। আমার কাছে ছোট অক্ষরের কুরআন আগেও ছিলো। সেদিন রাতে কেন জানি আমি বিছানায় বসলাম সেই কুরআন খন্ড হাতে নিয়ে। পাশে জ্বালালাম একটি মোমবাতি। জানালা খুলে দিলাম। গ্রীষ্ম কালের একটি সুন্দর সোনালী সন্ধ্যা। আবহাওয়া চমৎকার, চারিদিক নির্জন। একটা পবিত্র অনুভুতি অনুভব করছিলাম, অতি সুন্দর।

........কুরআন পড়া শুরু করলাম অন্যান্য রাতের মতো আর ভাবনা গুলো খেলতে শুরু করলো মাথার ভেতরে। মনে হলো বইটিতে ঠিক সেই কথাগুলিই লেখা আছে যা একজন সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে হওয়া উচিত। আবার এক ধরনের দ্বন্দও কাজ করছিলো, কি জানি হয়ত ঈশ্বরই (স্রষ্টাই) নেই, আমি ঠিক বোঝাতে পারবোনা, আমার কারো সহায়তা দরকার ছিল তখন দারস্থ হতে, আমি কুরআন হাতে ধরে সোজা হয়ে বসলাম।

........বললাম ও ঈশ্বর (স্রষ্টা), তুমি যদি থেকেই থাকো আমাকে একটা চিহ্ন দেখাওতো, ভালো বা বড় কিছু। যেমন ধরো এই গরমে এখানে বজ্রপাত হয়না, এখন তুমি যদি আকাশ ফাটিয়ে প্রচন্ড শব্দে একটা ফেলে দাও (বজ্রপাত), আমি বুঝব তুমি আছ। অথবা নিঃশব্দে একটা বিদ্যুৎ চমক দেখাও আকাশের দিগন্তে আলোক ছটা নিয়ে, যদি তুমি এরকম শোনাও বা দেখাও-আমি তোমার, তোমারই গোলাম হয়ে যাবো, কথা দিলাম ।

আকাশে তারা ছাড়া আর কোনো আলো নেই, বজ্রপাত তো দুরের কথা জেট বিমানেরও কোনো শব্দ এলোনা।

........ঠিক আছে অসময়ে বজ্রপাতের জন্যে হয়তো তুমি রাজি নও ঈশ্বর (স্রষ্টা), তাহলে মটমট করে একটা ডাল বা কোনো কিছু ভাঙ্গার শব্দ শোনাওনা। (কিন্তু) না, কিছু কানে এলোনা।

........ঠিক আছে ঈশ্বর, আমার সামনে যে মোমবাতিটি জ্বলছে তার শিখাতে একটা বিস্ফোরণ ঘটাও দুই ফুট উচু সিনেমায় যেমন দেখায়, আমি মুগ্ধ হয়ে তোমাকে বিশ্বাস করবো। মোমবাতি মিটমিট করেই জ্বলতে থাকলো।

........আমি অপেক্ষায় অথচ কিছু ঘটছেনা একটু হতাশা আর গোস্বা অনুভব করলাম।

বললাম ঈশ্বর (স্রষ্টা), তুমি নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দাবি করো অথচ আমাকে তোমার কোনো চিহ্ন (নিদর্শন) দেখাতে পারলে না! ঠিক আছে আমি তোমাকে আর একটা সুযোগ দিচ্ছি, বজ্রপাতটি একটু বেশি চাওয়া হয়ে গেছে, সব সময় যা

হয় সেরকম কিছু করাও, একটা গাড়ীকে লম্বা হর্ন দিয়ে রাস্তা দিয়ে পার করাও, আমি এত ছোট কিছু চাইছি তোমাকে বিশ্বাস করার জন্যে। ধরে নেবো এটাই আমার জন্যে তুমি আছ তার চিহ্ন, ঠিক আছে ?

........অবাক কান্ড, ঈশ্বর (স্রষ্টা) একটা ট্যাক্সিও খুজে পেলেন না যেটা হর্ন দেয় ! মনটা খারাপ হলো, চুপ মেরে আছি। মনে হলো আমি মহাশূণ্যের নিস্তব্ধতায় বসে আছি । একটি পিপড়ার পায়ের শব্দও শুনছি না। আমি একটু ভেঙ্গেই পড়লাম, ভেবেছিলাম আজকের এই মুহুর্তটিতে আমি কিছু একটা খুঁজে পাবো, যা ঈশ্বর (স্রষ্টা) থাকার নিদর্শন। না, কিছু হলনা।

........হতাশ হয়ে অলস ভঙ্গীতে কুরআন হাতে উঠিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতেই চোখ আটকে গেলো একটি আয়াতের দিকে, **"আকাশে এবং যমীনে মু'মিনদের (শিক্ষার) জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে। তোমাদের সৃষ্টিতে, আর প্রাণীকুল ছড়িয়ে দেয়ার মাঝে নিদর্শন আছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য। রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন আর বায়ুর পরিবর্তনে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"** [সূরা আল-জাসিয়া ৪৫ : ৩-৫]

........হঠাৎ মর্মে অনুধাবন হলো ছোট বেলা বাবা বলেছিলেন, এমনি এমনি হয় প্রাকৃতিক নিয়মগুলি, আমার বোঝা হয়ে গেল এমনি এমনি কিছু হয়না, তাতে একজন ডিজাইনার লাগে। তিনি আমাকে তার উপস্থিতি জানিয়েছেন। আমি (এখন) মুসলিম হবো।

........পরদিন সন্ধ্যায় রমজানের প্রথম রাতে আমি যখন মসজিদে অপেক্ষা করছিলাম, আর অসংখ্য মুসলিম তারাবীহর সালাত (নামাজ) পড়ছিল তখনও এক ধরনের ভয় কাজ করছিলো মনের ভেতর, কিন্তু যখন শেখ ফাহমী আমাকে সত্যই শাহাদা (সাক্ষ্য) পড়াচ্ছিলেন, কোথায় চলে গেলো সব দ্বিধা, মনে হলো কাদেরকে ভাবতাম এতোদিন সন্ত্রাসী ! মনে হচ্ছিলো আমি একা কোথাও দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর গড়িয়ে পড়ছে ঠান্ডা জল, অদ্ভূত এক পবিত্র স্নানে নির্মল হয়ে উঠছে আমরা সর্বাঙ্গ, তনু-মন। সব মুসলিম ভাইয়েরা আমাকে আলিঙ্গন করে যাচ্ছে মায়া আর ভালবাসার স্পর্শ নিয়ে। আমি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছি।

........১৯৯৬ সনে বুবেন মাত্র ২০ বছর বয়সে 'আবু বকর' নাম ধারণ করেন আর বলেন, পশ্চিমারা ধর্মান্তরিত হলে বলে কনভার্ট, মানুষ যখন ইসলাম ধর্মে ঢোকে সে কনভার্ট নয় সে হয় রিভার্ট, যিনি ফিরে আসেন। মুসলিম কোনো নাম নয়, মুসলিম একটি ক্রিয়াপদ, ভার্ব। আমার বাসার পেছনে যে বড় গাছটি আছে সে আল্লাহর হুকুম পালন করছে, আল্লাহ তাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তাই মেনে চলছে। গাছটি মুসলিম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী) কারণ সে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে।

........যখন একটি বাচ্চার জন্ম হয় তখন ক্ষুধা লাগলে কাঁদে, সব বাচ্চারাই কাঁদে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম সে আল্লাহর ডিজাইনে করে। সে তখন মুসলিম। যখন সে বড় হয় তখন সে অন্যদের কাছ থেকে নতুন কিছু শিখে এবং অন্যের আদর্শকে অনুসরণ

www.QuranerAlo.com

করে মুসলিম থেকে সরে যায় (অমুসলিম হয়)। পরবর্তী সময়ে সে যদি ফিরে আসতে চায় সে রিভার্ট করছে নিজেকে, কনভার্ট নয়। কারণ *"প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায় ।*[৭১]

আমি ফিরে এসেছি মানুষের জন্যে এক অফুরন্ত জীবনের উৎসে, আমি একজন মুসলিম, বাকিরাও তাই ছিলো, তারাও আসবে একদিন ফিরে । আল্লাহ বলেন---

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" [সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১৩]

এই বাস্তব ঘটনাটি নিজেই.....বলেছেন (রুবেন) 'আবু বকর'।[৭২]

একজন হিন্দুর ইসলামে ফিরে আসার হৃদয়বিদারক কাহিনী

দেখছি আমার মা আগুনে জ্বলছে, সত্যই কি এটি বিধাতার (স্রষ্টার) হুকুম!

সে একজন নব মুসলিম তার নাম "আব্দুর রহমান"। পূর্বে নাম ছিল নারায়ন। তার বাসস্থান উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া। সে একজন ঠাকুর বংশের ছেলে। কীভাবে ও কি কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা জানতে চাওয়ায় সে বলল :

........আমার গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। সেখানেই আমি লেখাপড়া করতাম। একই গ্রামের 'আব্দুল্লাহ' নামে আমার এক বাল্য বন্ধু ছিল। আমরা এক সাথে একই ক্লাসে পড়ালেখা করতাম। সে সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে। আমি তার বাড়িতে যেতাম। সেও আমার বাড়িতে আসতো। সুখে দুঃখে আমরা একজন আরেকজনের সব সময় খোঁজ খবর নিতাম। ক্লাস রুমে একই সাথে বসতাম। একজন অপরজনের পাশেই ছিলাম। এমনিভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হচ্ছিল। আমরা যখন ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলাম, একদিন তার মা হঠাৎ মারা গেল। তাই আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার বাড়িতে গেলাম। তার মা অত্যন্ত পর্দা মেনে চলতো। জীবদ্দশায় তার বাড়িতে কতবার গিয়ে ছিলাম কিন্তু একটি বারও আমার নজরে পড়েনি। যদিও আমি ছোট ছিলাম, মনে মনে ভেবে ছিলাম, মৃত্যুর পর এবার একনজর তাকে দেখব । কিন্তু......... ।

মুর্দার খাটে করে তাকে কাফন পড়িয়ে (সসম্মানে) এমন ভাবে তার উপর আর একটি পর্দার ব্যবস্থা করে কয়েক জনের কাঁধে করে বাড়ি থেকে বের করল। অন্য

---

৭১ মিশকাত, মুত্তাফাকু আলাইহ; হা নং ৯০ ।

৭২ উল্লেখ্য 'আবু বকর' একজন মনস্তত্ত্ববিদ এবং একজন ফিল্ম-মেকার। প্রেস্টন ভিক্টোরিয়াতে তার নিবাস।
Youtube সার্চ দিতে পারেন A Very Nice Conversion/Reversion To Islam Story - Brother Reuben(Abu Bakr) From Australia এই নামে । নিচে ভিডিওর লিংক দেয়া হলো Video Link
https://www.youtube.com/watch?v=guwh5V6yXEg

www.QuranerAlo.com

কারো অনুমান করা সম্ভব নয় যে আব্দুল্লাহর মা কত বড় ছিল? লম্বা ছিল, না খাটো ছিল? মোটা ছিল, না পাতলা ছিল?

........সবাই তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন দুআ পড়তে পড়তে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে। তাই আমি তাদের সাথে কবরস্থানের দিকে রওয়ানা হলাম। আর মনে ইচ্ছা ছিল যে, কবরে নামানোর সময় একটু দেখব। কিন্তু আমার মনের আশা আর পূরণ হলো না। কারণ তার মাকে কবরের নামানোর পূর্বেই কবরের চতুর পার্শ্বে চাদর/পর্দা দিয়ে ঘিরে তার পর তাকে সসম্মানে নামানোর ব্যবস্থা করল। ভাবলাম এটা হয়তো তাদের ধর্মের বিধান।

........যাক পরিশেষে আমার বন্ধুকে কিছু সান্তনা দিয়ে আমার বাড়িতে ফিরে আসলাম। আল্লাহর কি ইচ্ছা কয়েকদিন পরেই আমার মা-ও ইহজগৎ পরিত্যাগ করলেন। আমার মুসলিম বন্ধুটিও এমন দুঃখের দিনে পাশে এসে আমাকে সান্তনা দিতে ত্রুটি করেনি। আমার মা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ছিলেন বিধায় তিনি তার জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের চোখে দেখা দিতেন না।

........হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী মাকে শ্মশানে নিয়ে চিতায় পুড়াতে হবে। তাই বাড়ি থেকে বের করা হলো। আমার মা এর উপরে এমন এটি পাতলা কাপড় ছিল যে, ভিতর থেকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। আমার বন্ধু আমার পাশে ছিল তাই কিছুটা সংকোচ বোধ করছিলাম। তার পর আমার মাকে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানে, রাখা হলো চিতায়। আগুন দেয়ার সাথে সাথে তার উপরে পাতলা আবরণটি পুড়ে গিয়ে আমার মা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলছে। আমার লজ্জায় মাথানত হয়ে আসছে। আমার বন্ধুর দিকে তাকাতে পারছি না। কিন্তু উপায় নেই, এতো আমাদের ধর্মের বিধান!

আগুন যখন ভালভাবে ধরেছে তখন দেখি আমার মা তখন বাঁকা হতে চাচ্ছে। আবার কখনো সোজা আবার কখনো দাঁড়াতে চাচ্ছে। এদিকে পাশে অনেক লোক কারো হাতে লাঠি ও বল্লম। তারা সবাই তাকে আঘাত করে সেই আগুনেই যথাযথ ভাবে পুড়তে বাধ্য করছে। কি করুণ দৃশ্য! এ বেদনাদায়ক দৃশ্য আমাকে যেন হতবাক, অচেতন করে ফেলেছে।

........হঠাৎ আমার সামনে ভেসে উঠল বন্ধু আব্দুল্লাহর মায়ের কাফন দাফনের সুন্দর দৃশ্য। কত সম্মানজনক ভাবে তাকে মাটি দেয়ার পর তার চির শান্তির জন্য সবাই দোয়া করে বিদায় নিল। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখনও তার সম্মানের কিছু কমতি ছিল না। মৃত্যুর পরও তাকে যথাযথ সম্মানে কবর দেয়া হলো। মনে হয় পরগজতেও তাঁর সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে।

.....আমার জ্ঞান আবার ফিরে আসল। দেখছি আমার মা আগুনে জ্বলছে! কত কষ্ট, কত যাতনা ও কত বেদনা আমি পেয়েছি যা আজ বর্ণনার ভাষা নেই। আমার মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর করতেন।

........আমার মা অভিজাত পরিবারে সসম্মানে জীবন যাপন করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের হলেও আমার মা সাধারণ মানুষের সাথে দেখা দিতেন না। বাড়ির বাহিরে যেতেন

www.QuranerAlo.com

না। অন্যান্য (বাজে) মেয়েদের মত ঘোরাফেরা করতেন না। আস্তে আস্তে কথা বলতেন। শান্ত মেজাজের ছিলেন তিনি। ঝগড়া ফাসাদকে তিনি কখনো পছন্দ করতে না। এমন সুন্দর স্বভাবের মা ছিলেন আমার। সুখ ও শান্তিতে ইজ্জতসহ বসবাস করতেন তিনি, অথচ মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে এমন করে বেইজ্জত করা হলো! (আশ্চর্য!) তার চেহারা অপর কেউ দেখেনি, কিন্তু জীবনটা চলে যাওয়ার সাথে সাথে কি অবস্থা ! তিনি কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি, এমন কি কারো সাথে ঝগড়া করেননি, গালিও দেননি। কিন্তু তার আত্মা বিদায় নেয়ার সাথে সাথে এ ভাবে মানুষ তাকে আঘাত করছে কেন? চোখের সামনে এই যদি হয় তার অবস্থা তবে পরজগতে ? এ কঠিন অবস্থায় নানা ধরনের প্রশ্ন জাগছিল আমার হৃদয়ে। তন্মধ্যে সব চেয়ে বড় যে প্রশ্নটি আমার হৃদয়ে উদ্ভব হয়েছিল তা হলো : সত্যিই কি চিতায় পুড়ানো ঈশ্বরের (স্রষ্টার) হুকুম??? (কক্ষনো ভেবেছেন কি?)

........এর পর হতে আমি ধর্ম নিয়ে গভীর ভাবে গবেষণা শুরু করলাম। এক এক করে হৃদয়ের সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজতে শুরু করলাম। পরিশেষে আমি অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পেলাম। ভুলপথ ছেড়ে মহান প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার সঠিক পথে চলে আসলাম। বুঝতে আর দেরি হলো না যে, ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, যাতে রয়েছে দুনিয়াতে সম্মান মৃত্যুর পর সুখ ও পরকালেও শান্তি। তাই পড়ে নিলাম *"আশ-হাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রসূলুহ।"* অর্থাৎ--*"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"*।

........এ ঘোষণা ছিল সম্পূর্ণ (নিরবে) নিরালায়, একমাত্র (মহান) সৃষ্টিকর্তার সামনে। তাই আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমার বাবা, ভাই, বোন কেউই জানতো না। এর পর থেকে বেশি সময় কাটতো একা একা, লোকের অগোচরে আমার রুমেই পড়ে নিতাম সালাত (নামাজ) সমূহ। আমার ঈমান অটল রাখার জন্য প্রার্থনা করতাম সেই মহান করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার কাছে। আমি গোপনে বিভিন্ন (বিশুদ্ধ) ইসলামী বই পড়তাম। যত জ্ঞান অর্জন করি ততই আমার আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) ও ইয়াকীন (দৃঢ়তা) বৃদ্ধি হচ্ছিল। এমনভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

........এদিকে (খেয়াল করলাম) আমার পরিবারের অনেকেই আমার প্রতি নজর রাখছে। একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করছে যে, সে এমন একা একা থাকতে পছন্দ করে কেন? কেউ বিভিন্ন সন্দেহও করছে আমার ব্যাপারে। আবার কেউ কল্পনা করছে মা মারা যাওয়ার কারণেই হয়তো সে মানসিক ভাবে আঘাত পেয়েছে। তবে আমার ব্যাপারটাও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে দুর্গা পূজার সময়। তারা ইচ্ছা করেছিল আমাকে পূজা মন্ডপে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম। সবাই জিজ্ঞাসা করছে, কেন তুমি পূজা-মন্ডপে যাবে না? কি হয়েছে? সেই মূহুর্তে আমার এ অনুভূতি হয়েছিল যে আমি এখন এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। এই পরীক্ষায় আমাকে অবশ্য উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই

শাস্তির ভয় না করে মৃত্যুকে বাজি রেখে ঘোষণা দিলাম যে, *"আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।"*

........এ খবর মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল সবার কানে কানে। এদিকে বাবা রেগে আগুন হয়ে আসল আমার রুমে। তার এক হাতে ছিল একটি লাঠি আর অপর হাতে ছিল একটি ছড়ি। এবার বাবা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছে যে, তুমি নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছ? আমি নির্ভয়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পড়েছি "লা--ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্" *"আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই"*। এবার বাবা নির্দয় হয়ে আমার উপর বেদম প্রহার শুরু করলেন। আর মুখে আমাকে বলতে ছিলেন ইসলাম গ্রহণের স্বাদ তোমার মিটিয়ে দিব। তার লাঠির আঘাতের বেগ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছিল, আর আমার মুখে ছিল *"লা--ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্"* অর্থাৎ--*"আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই"*। আঘাতের প্রচন্ডতায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমি জানি না কতক্ষণ জ্ঞানহারা অবস্থায় ছিলাম, আর এ সময়ের মধ্যে আমার প্রতি কি নির্মম নির্যাতন চালান হয়েছে তা এক মাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। তবে আমার চেতনা ফিরে আসার পর দেখি আমার শরীর ফেটে গিয়ে তা থেকে রক্ত ঝরছে।

........আশে পাশে চেয়ে দেখি আমার ভাই-ভাবীরা দাঁড়ান অবস্থায়। তারা সবাই বলছে, বাবা এবার এসে তোমাকে না কি বলি দেবে। অতএব তুমি এখন বলবে আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করব। এ ছাড়া তোমার পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। আমি নির্ভয়ে স্ব-জোরে তাদেরকে বলে দিলাম, *"আমি প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছি, সত্য ও সঠিক দ্বীন (ধর্ম) ইসলাম গ্রহণ করেছি।"* যদি আমার দেহ থেকে শিরোচ্ছেদ হয়ে যায় তার পরও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব না। আমি বিশ্বাস করেছি সেই মহান করুণাময় আল্লাহকে, যার হাতে আমার জীবন ও মরণ, যিনি পারেন বিপদ থেকে রক্ষা করতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ইজ্জত দিতে পারেন। যাকে ইচ্ছা তাকে অপমান করতে পারেন। তিনি ফকিরকে বাদশাহ করতে পারেন এবং বাদশাহকে ফকির বানাতে পারেন। তিনিই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

........আমার কথা শেষ হতে না হতেই বাবা আবার লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে আসল এবং নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার শুরু করল। প্রতিটা আঘাতে আমি আল্লাহকে স্মরণ করছি আর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে "লা--ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্"। ব্যাথার উপর আঘাত কত যে কষ্ট তা হয়তো আজ মুখে বর্ণনা করার মত নয়। এখানেই শেষ নয় বরং আমার শরীরে লবণ লাগিয়েছে তারা। ব্যাথা, যন্ত্রণা ও জ্বালায় আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সচেতন হয়ে দেখি, গভীর অন্ধকারে আমি মাটিতে পড়ে আছি, তারা আমার অদূরেই সবাই মিলে পরামর্শ করছে। আমি শুনতে পাচ্ছি, বাবা বলছে, না, তা হবে না। তাকে জবাই (বলি) করতেই হবে। ধর্ম ত্যাগের কি অপরাধ তা যেন অন্যরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। সময় ঠিক করল আগামী কাল প্রকাশ্যে দিবালোকে জবাই (বলি) করা হবে। তবে সমস্যা হলো বাকি রাত টুকু কীভাবে কাটবে ? কেউ বলছে সে তো অজ্ঞান অসুবিধা কোথায়। অন্যজন বলছে, যদি

www.QuranerAlo.com

রাত্রের মধ্যে জ্ঞান ফেরে, তারপর সে পালিয়ে যায়? কেউ প্রস্তাব দিচ্ছে যে তাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখা হোক। বাবা বললেন না, সে মুসলিম হয়েছে, সে ধর্মত্যাগী, অপবিত্র কোন মানুষকে আমাদের কোন ঘরে রাখা যাবে না। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে তুলসী গাছের পাশে একটি পরিত্যক্ত কূপে তাকে বাকি রাতটা রাখা হবে। জ্ঞান ফিরলেতো আর কোন অসুবিধা নেই।

........সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে সেই কূপে ফেলে দেয়া হলো। আল্লাহর কি কুদরত আমি যেন সেই কূপে আস্তে করে বসে পড়লাম। সেখানে কোন পানি নেই, গভীরতা তেমন না। আমার শরীরের ব্যথা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করল।

........অন্ধকারে কিছুই দেখতে পারছি না। একা একা উঠতে চেষ্টা করছি কিন্তু ব্যর্থ হলাম। কারণ কূপের মুখ একটি কড়াই দিয়ে ঢাকা, শুধু তাই নয় বরং সেই কড়াইয়ের উপর রয়েছে একটা ভারী পাথর। তাই নিরাশ হয়ে বসে আছি। বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছি, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর মুমিন (বিশ্বাসী) হিসাবে আমার মৃত্যু হবে (আহা!) এটাই আমার আনন্দ ।

........হঠাৎ করে উপরে দিকে একটা শব্দ পেলাম। নজর করলাম কে যেন কড়াইটি সরিয়ে দিল। তারপর আওয়াজ ছোট করে বলছে,দাদা ! দাদা! ও দাদা!

আমি বললাম কে? কে (তুমি) ?

সে বলল আমি তোমার ছোট ভাই 'উত্তম'। তোমার হাতটি একটু উঁচু করে আমার হাতটা ধর। আমি তাই করলাম সে আমাকে কূপ থেকে টেনে উপরে উঠিয়ে বলল দাদা! এখন রাত তিনটা ত্রিশ মিনিট। সিদ্ধান্ত হয়েছে সকালবেলা তোমাকে বাবা প্রকাশ্যে বলী (জবাই) দিবে। আর এ সিদ্ধান্তের কারণে আমার ঘুম আসেনি। সবাই ঘুমিয়েছে এই সুযোগে আমি এসেছি দাদা।

........আমাকে ক্ষমা কর দাদা। আর দেরি না করে তুমি এক্ষুনি চলে যাও। অনেক দূরে চলে যাবে, যাতে কেউ তোমার খোঁজ না জানে। আমি তার চেহারার দিকে লক্ষ করলাম। তার দু নয়ন থেকে অশ্রু ঝরছে আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। সে আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসত। সেও আমার অতি প্রিয়। আমার হাত ধরে অনুরোধ করেছে দাদা আর বিলম্ব করা কিছুতেই ঠিক হবে না। যদি কেউ টের পেয়ে বসে তবে......... ।

........আমি আমার চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। ছোট ভাইটির মুখে একটি চুমু দিয়ে তার থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে সরে পড়লাম । রাতের অন্ধকারের এ ঘটনায় আমার ঈমান আরও কয়েক গুন বৃদ্ধি পেলো যে, রাখে আল্লাহ মারে কে ??? তাই কিছুদূর গিয়ে আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে গেলাম। সেই প্রভুর দরবারে জানিয়ে দিলাম---- *হে মহান স্রষ্টা সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই, সকল ক্ষমতার মালিকও এক মাত্র তুমিই, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।*

........তারপর আমি আমার বাল্যবন্ধু আব্দুল্লাহর বাড়ি সরাসরি চলে গেলাম। আল্লাহর কুদরতে আমি বেঁচে আছি এ খবর দিয়ে তাদের পরামর্শে অনেক দুরে এক

মাদ্রাসায় গিয়ে উঠলাম। সকল চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভাল ভাবে জানার জন্য মনোনিবেশ করলাম। আমার বন্ধু আব্দুল্লাহ মাঝে মাঝে বিভিন্ন খবরা খবর জানিয়ে পত্র লিখত। এমন ভাবে দীর্ঘ দিন কেটে গেল। হঠাৎ একটি পত্র পেলাম, তাতে সে লিখেছে আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ। অনেক দিন অসুস্থতার কারণে তিনি বিছানাতেই প্রস্রাব-পায়খানা করছে। বেহুঁশ অবস্থায় ঘরের মধ্যে অবস্থান করছেন। দুর্গন্ধের কারণে কোন ছেলেও তার কাছে যায় না।

........এসে দেখলাম অবস্থা করুণ। ভাই-ভাবীরা টেলিভিশন দেখে আনন্দ উল্লাসে ব্যস্ত। কেউ তার খবর রাখে না। আমি নিজ হাতেই বিছানা পত্র সহ সবকিছু পরিষ্কার করলাম। তার শরীর ভিজা গামছা দিয়ে মুছে দিয়ে আতর ব্যবহার করলাম। তারপর ডাক্তারকে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সহ কিছু ফল ক্রয় করে নিয়ে আসলাম।

আল্লাহর কি অশেষ মেহেরবানি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বাবার জ্ঞান ফিরে আসল। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি মাঝে মাঝে চক্ষু মেলে দেখেন। কিছু বলতে চাচ্ছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। আমাকে চিনতে পারছেন কি না আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ আমার মুখে আছে দাড়ি, মাথায় আছে টুপি, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ঔষধ সহ পথ্য সেবন যথানিয়মে চলছে। আর তাকে মাঝে মাঝে বসানোর ব্যবস্থা করতাম, হাত-পা নড়াচড়ার ব্যবস্থা করতাম। তাতে তিনি দ্রুত সুস্থ হতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ চোখ খুলে বাবা আমাকে বলছেন,

তুমি কে? : আমি আপনার মেজ ছেলে। তুমি? তুমি না ইসলাম গ্রহণ করেছ? : হাঁ!

কি জন্য এখানে এসেছ? : আপনার খেদমত করার জন্য। কে তোমাকে পাঠিয়েছে?: আমার সৃষ্টিকর্তা সেই মহান করুণাময় সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন।

তোমার সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন ? তুমি তো মুসলিম আর আমি তো হিন্দু ?

বাবা আমাদের দ্বীন (ধর্ম) ইসলাম। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

আমাদের ইসলাম এতো সুন্দর ধর্ম (দ্বীন) যে, যদি পিতা অন্য ধর্মাবলম্বী হয় তারপরও জীবদ্দশায় এ পৃথিবীতে তার খেদমত, তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে সেই সৃষ্টিকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সৃষ্টিকর্তা এরশাদ করছেন: **"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।"** [সূরা লোকমান ৩১ : ১৫]

সত্যিই ইসলাম গ্রহনের এই ঘটনাটা খুবই হৃদয়বিদারক।আল্লাহ আমাদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দান করুক আমিন।[৭৩]

আমার ইসলামের আসার গল্প

(এই বইয়ের সংকলক বলছি)-**আমার ইসলামের পথে ফিরে আসার ছোট গল্প এবার আপনাদের বলব:** আমি জন্মগতভাবে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আর তখন প্রকৃত মুসলিমও ছিলাম না। এটা বলা যায় যে নামে মুসলিম ছিলাম কাজে কিছুই না। আমি তখন কলেজে পড়াশোনা করি তৃতীয় বর্ষে। আমাকে সবাই সালাত (নামাজ) পড়তে বলত, কিন্তু আমি নিয়মিত (৫ ওয়াক্ত) সালাত (নামাজ) পড়তাম না। আসলে আমার ভিতরে অনেক সময় বিভিন্ন সন্দেহমূলক প্রশ্ন জাগ্রত হত। আমি তখনো কুরআন বাংলা অর্থসহ পড়িনি একবারও না--অবাক করা ব্যাপার ! আল্লাহ কি আসলেই আছেন? কুরআন কি আল্লাহর বাণী ? কবরে কি আসলেই আযাব (শাস্তি) হয়? পরকাল বলতে আসলেই কিছু আছে কি? এরকম অনেক নাস্তিক টাইপের প্রশ্ন । যাচাই করা দরকার।

......এর উত্তর কোথায় পাব? কি আর করার। শুরুতেই কুরআন নিয়ে পড়া শুরু করলাম আসলে এটা আল্লাহর বাণী কিনা দেখার জন্য। তো কুরআন যতই পড়ছি ততই জানছি আল্লাহর সম্পর্কে, আরও জানলাম আল্লাহ নিজেই চ্যালেঞ্জ করেছেন যে “এটা (কুরআন) **সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই**”, এই কুরআনে যদি তোমরা বিশ্বাসী না হও , তাহলে এরমত একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো, মূলত এই রকম আরও চ্যালেঞ্জ আছে যাতে আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসী হলাম যে এই কুরআন অবশ্যই আল্লাহর বাণী। তাই যতই আমি কুরআন পড়ছি ততই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে কুরআনের মত একটা আল্লাহর বাণী সেটা আমার ১৮ বছরের জীবনে একবারও পড়ে দেখলাম না আমি। আসলেই আমি কত-হতভাগা! আমি আমার সারা জীবন ব্যয় করেছি দুনিয়াবী বিদ্যা অর্জনের জন্য, মানবরচিত বইয়ের পিছনে। অথচ কুরআনেই আছে সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার। এক কথায় সবকিছু। এ জ্ঞান থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম। তখনও আমি আরবিতে কুরআন পড়তে পারতাম না। তাই নিজেকে খুব অশিক্ষিত (মূর্খ) মনে হতো। দুনিয়াবি লাভের জন্য গণিত শিখলাম, ইংরেজদের ভাষা ইংরেজী শিখেছি কিন্তু কুরআনের ভাষা, পরকালের ভাষা আরবি শিখলাম না! আহ !

৭৩ সূত্রঃ ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম ।ফেব্রুয়ারী ১১, ২০১৫ ইসলামিক ডেস্ক ।

www.QuranerAlo.com

......খুবই খারাপ লাগল। তখন ইচ্ছা করলাম আরবি শেখার। বাসার পাশেই এক মাদ্রাসায় গেলাম। মাদ্রাসার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক "মুহাম্মাদ হুসাইন" স্যারকে অনুরোধ করলাম আমাকে কিছু সময় ধরে যাতে আরবি শিখান এবং এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক দিব বললাম। তিনি রাজি হলেন কিন্তু তিনি পারিশ্রমিক নিবেন না। আমিতো অবাক! যেভাবে সমাজে কুরআন শিখানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া হয় সেখানে তিনি নিচ্ছেন না এজন্যে। হয়ত এই বয়সে কুরআন শিখার প্রতি আগ্রহী দেখে তিনি আমাকে পড়াবেন বলে আশ্বস্থ করলেন--আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক (আমিন)। যাই হোক সপ্তাহের কিছুদিন ইশার নামাযের পর তার কাছে কুরআন ছহীহ শুদ্ধভাবে পড়া শুরু করলাম। প্রথমে খুব কষ্ট হতো উচ্চারণ করতে পারতাম না। তিনি খুব কষ্ট করে ধীরে ধীরে পড়িয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক (আমিন)। আস্তে আস্তে কুরআন পড়া সহজ হয়ে গেল। অবশ্য আল্লাহই সহজ করে দিয়েছেন। এভাবে ২-৩ মাসের মধ্যে কুরআন পড়া শিখলাম আল-হামদুলিল্লাহ। একদিন আমার চাচার বাসায় বসে ইসলামি বই খুজছি-তখন একটি বই চোখে পড়ল-বইটির নাম *"হাকিক্বতে সুন্নাত বিদআত ও রসুমাত"*-লেখক *"মুফতী আলী হুসাইন"*। বইটি পড়লাম খুব আগ্রহের সাথে , একি কান্ড! বইতে কুরআন-সুন্নাহ এর দলিলের আলোকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে মুসলিমরা তো সেগুলোই করছে যেমন--- শিরক-বিদআত অহরহ করে যাচ্ছে। বইটি নিয়ে আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক "মুহাম্মাদ হুসাইন স্যারের" কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম স্যার এই বইতে অনেক বিষয় লিখছে যেগুলো মুসলিমরা অহরহ ধর্মের নামে করছে অথচ তা ইসলাম সমর্থন করে না। তিনি বললেন হ্যা; এইগুলো মুসলিমরা না জেনে করছে, অনেককে করতে বাধ্য করা হচ্ছে, কেউ বা চাকরি বাচানোর জন্য বাধ্য হয়ে করছে।

......আমি বললাম, এই শিরক-বিদআতগুলো পরিহার করতে চাই। তিনি বললেন আপনি এগুলো থেকে বিরত থাকতে পারেন। আবার দেখলাম অনেক আলেমদের মধ্যে কিছু মাসআলা বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে । তো আমি চাচ্ছি যেটা সঠিক সেটা আমি গ্রহণ করব। সে যে মতবাদেরই হোক না কেন। স্যার, বললেন আপনি যে কোন মতবাদের অনুসরন করতে পারেন। এছাড়াও প্রচলিত ফিকহের বাইরে, কুরআন-সুন্নাহ এর অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ফিকহের মাস'আলা অনুসরন করতে পারেন তাতে কোন সমস্যা নেই। যদিও স্যার অন্য ফিকহ এর অনুসরণ করেন তবুও তিনি সত্য কথাটাই বলেছেন যা আজকের অনেক আলেমই বলতে চান না ও মানতে চাননা। এ জন্য শুকরিয়া আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক আমিন। এরপর থেকেই শুরু হল তালাশ (অনুসন্ধান)। কুরআন পড়া সম্পূর্ণ শেষ করলাম। কিছু হাদীছ গ্রন্থ ও ইসলামি বই কিনে পড়লাম । ইন্টারনেট থেকে অনেক ইসলামি বইয়ের Pdf পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে পড়লাম।

......অনেক প্রসিদ্ধ ইসলামি বক্তার লেকচার ডাউনলোড করে শুনলাম ,অনেক কিছু শিখলাম তাদের লেকচার (বক্তৃতা) থেকে।

........তখন কেবল ধীরে ধীরে আমি নিয়মিত নামায পড়া শুরু করলাম। দাড়ি রাখব কি রাখব না। স্বীদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। দাড়ি রাখা যেহেতু নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নির্দেশ যেহেতু নবী ﷺ কে ভালবাসি--তাই তার অনুসরন অবশ্যই করতে হবে। কিতাব পড়ে যখন জানলাম দাড়ি রাখা ওয়াজিব কোন কোন আলেম বলেছেন ফরজ। তখন দাড়ি রাখলাম ।
আল্লাহ আমার পথ সহজ করে দিলেন।

......আর এভাবেই আস্তে আস্তে ইসলামের পথে তথা শাশ্বত কল্যাণের পথে প্রবেশ করলাম। আর বর্তমানে আমি ইসলামের গভীর জ্ঞান অন্বেষনে নিয়োজিত আছি। মূলত আল্লাহই আমাকে হেদায়েত (সঠিক পথ) দিয়েছেন ও আমার দ্বীনে চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। এ জন্য সকল প্রশংসা ও গুনগান একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি মহাক্রমশালী ও পরম দয়ালু ।

www.QuranerAlo.com

নবম অধ্যায়ঃ

ইসলাম সম্পর্কে কিছু সংশয়মূলক প্রশ্নের উত্তর

১. অনেকের মাঝেই এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে আচ্ছা মেনেনিলাম ইসলাম সঠিক ধর্ম, আল্লাহ বলতে একজন আছেন। এখন কথা হলো আল্লাহ এত নবী-রাসূল কেন পাঠিয়েছেণ ? একজন নবী-রাসূল পাঠালেই হতো কিনা?

উত্তরঃ আচ্ছা ভাই আপনি/আমি পড়াশুনা শুরু করি প্রাইমারি স্কুল থেকে একের পর এক ক্লাস অতিক্রম করে- এস.এসসি. এইচ এস.সি অনার্স, মাষ্টার্স,বিসিএস পড়ার পড় কেউ চাইলে শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচ.ডি করতে পারি।

......আপনি কি কখনো শুনেছেন প্রাইমারি হাই-স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়ে কেউ সরাসরি পিএইচডি করেছে ? না, কেউ করেনি আর তা করতেও পারবে না।

......ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রত্যেক যুগে নবী-রাসূলদেরকে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে তাদেরকে ছোট ছোট সহিফা বা ছোট কিতাব দিয়ে মানুষদের মাঝে প্রচার করতে ও তা দিয়ে শিক্ষা দিতে পাঠিয়েছেন। এক এক যুগে আল্লাহ তার রাসূলদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন যা এক এক সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক ও হেদায়েতস্বরুপ।

......প্রথমে এসব কিতাবে অল্প অল্প করে দ্বীনের বিধি-নিষেধ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর আস্তে আস্তে বিস্তারিতভাবে নাযিল হয়েছে এবং সব কিতাবেরই মূল দাওয়াত হল *"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"* অর্থাৎ **"আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত) মাবুদ নেই।"** অর্থাৎ সমস্ত ইবাদত এক আল্লাহরই করতে হবে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বড় বড় কিতাবও নাযিল করেছেন। যেমন-তাওরাত, যবুর ,ইঞ্জিল ও সর্বশেষ কুরআনুল কারীম। কুরআনুল কারিম হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

......আর এ কুরআন হচ্ছে পি.এইচ.ডির মত সর্বোচ্চ শিক্ষা। যা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে নাযিল করা হয়েছে। এটিই আসমানি কিতাবের ফাইনাল ইডিশন (সর্বশেষ সংস্করন) এরপর কেয়ামত বা পৃথিবী ধ্বংস পর্যন্ত আর কোন আসমানী কিতাব আসবে না এবং একমাত্র কুরআনই তার পূর্ববতী কিতাব যেমন, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এর সত্যায়ন করে।

......আল্লাহ যদি সরাসরি একসাথে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করতেন তাহলে লোকেরা হয়তো মানতে চাইত না। তারা হয়ত বলত এতগুলো বিধি-বিধান মানতে পারা যায় না। আর এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পৃথিবীর শুরু থেকে আদম আঃ সময় থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে অনেক নবী-রাসূলদের পাঠিয়ে ছোট ছোট

কিতাবের মাধ্যমে মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহর ইবাদতের আহবান জানিয়েছেন । আর সর্বশেষে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে কুরআন নাযিল করেছেণ।

২. যেসব হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইয়াহুদী ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না, অথচ তারা পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করে যান, তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে ?

উত্তরঃ তারা পার্থিব প্রতিদান পাবে, পরকালের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত কমন সেন্স (সাধারণ বিবেক) তাদের ছিল এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার যথেষ্ট উপকরণ তারা পেয়েছিলেন, এরপরও তারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তাই তারা জান্নাতে যেতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ কারো ওপর জুলুম করেন না। তারা যা ভালো কাজ করেছেন, এর প্রতিদান পৃথিবীতে তাদের দিয়েছেন। মানুষ তাদেরকে চিনেছে, জেনেছে। তাদের মৃত্যুর পরও তাদের সুনাম পৃথিবীর মানুষ করেছে। তাদের ভালো কাজের পার্থিব প্রতিদান আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন। যেমন-মাদার তেরেসা সহ শত শত অমুসলিম লেখক,কবি, বিজ্ঞানি সমাজসেবক ।

কিন্তু পরলৌকিক প্রতিদানের জন্য যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর (ঈমান) বিশ্বাস স্থাপনটা জরুরী (প্রয়োজন), যা তাদের বেলায় অনুপস্থিত, তাই তারা পরলৌকিক কোন প্রতিদান পাবেন না।

৩. যেসব এলাকায় ইসলামের বাণী (দাওয়াত) পৌঁছে নি, তাদের বিধান কী? ইসলাম কি বলে?

উত্তরঃ তাদেরকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন পরীক্ষা করবেন। তারা উত্তীর্ণ হলে জান্নাতে যাবে, না হলে জাহান্নামে যাবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তাদের মধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছে।

এক : যারা মুসলিমদের মাঝে ছিলেন, ইসলামের কথা শুনেছেন, ইসলাম সম্পর্কে জানা তাদের জন্য সহজ ছিল, এরপরও তারা ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধান করেননি। তাদের অবস্থা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত লোকদের অবস্থার অনুরূপ হবে। যেহেতু তারা ইসলামকে বোঝার ও জানার জন্য চেষ্টা করেনি তাই তাদের জন্য জাহান্নামই (নরকই) নির্ধারিত থাকবে।

দুই : যারা অমুসলিমদের মাঝে ছিলেন, ইসলাম সম্পর্কে জানার কোনো উপায় ছিল না। ইসলামের কথা কখনো শুনেও নি। তাদের অবস্থা আহলুল ফিতরাহ *(দুই নবী এর অন্তবর্তীকালীন সময় যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি)*- এর মতো হবে। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করবেন। যেমন-আল্লাহ বলবেন, আগুনে ঝাপ দাও। যারা তাঁর অনুসরণ করবে, তারা আগুনে ঝাপ দিয়ে দেখবে সেটা শীতল জান্নাত (বেহেশত)। যারা অমান্য করবে, তারা সত্যিই জাহান্নামে (নরকে) যাবে।

এভাবে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের পরীক্ষা নিবেন। আল্লাহ বলেন,

www.QuranerAlo.com

“আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিইনা।” [সূরা ইসরা ১৭ : ১৫]

ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, *“এটা আল্লাহর ইনসাফের প্রকাশ। আল্লাহ কাউকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ ছাড়া শাস্তি দিবেন না।”*

৪. যেসব খৃষ্টান এক আল্লাহ ও ঈসা عليه السلام এর ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের কী হবে?

উত্তরঃ মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমনের পর একমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে মুক্তি দিবে। কাজেই অন্য কারো প্রতি বিশ্বাস থাকাটা যথেষ্ট হবে না।

রাসূল ﷺ এর আগমনের পর তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই একমাত্র দ্বীন (ধর্ম)। কাজেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস না থাকায় তাদের অবস্থাও প্রথম উত্তরে উল্লিখিত মানুষের অবস্থার অনুরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যে যুগে যাঁকে পাঠিয়েছেন, সে যুগে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই ছিল সঠিক পথ। সর্বশেষ তিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঠান। শেষ নবীর পরে অন্য সব মতবাদ (ইজম) ধর্ম, দর্শন বাতিল।

মহান আল্লাহ বলেন, **“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”** [সূরা আল-ইমরান ৩ : ৮৫]

বরং, পূর্বের কোনো ধর্মের অনুসারী যখন ইসলামের আগমনের পর ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার জন্য বেশি সওয়াবের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন, **“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবিঈরা[৭৪] -(তাদের মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে - তবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।”** [সূরা বাকারা ২: ৬২]

ইয়াহুদী, খৃষ্টান যারা রাসূল ﷺ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি তাদের সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, *“সেই মহান সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের কোনো ইহুদী, খৃষ্টান যদি আমার কথা শুনে, এরপর আমার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আগেই মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামবাসী হবে।”*[৭৫]

অপর হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ *“আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেনঃ যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার[৭৬] করবে ।”* [৭৭]

---

৭৪ সাবিঈ- বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারী মতান্তরে ফেরেশতাদের উপাসনাকারী।

৭৫ মুসলিম হাদিস নং ১৫৩ মুসনাদে আহমাদ ৮২০৩ ।

৭৬ যারা আল্লাহর রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও ওহীকে সত্য জেনেও স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ ক'রে নিজেদের খেয়াল-খুশির অন্ধ অনুকরণ করে তারা আল্লাহর রাসূলের অবাধ্য ও অস্বীকারকারী (কাফির)।

৭৭ সহীহ বুখারী হাদিস নং ৭২৮০।

www.QuranerAlo.com

Contents

বস্তুত আল্লাহ কারো ওপর জুলুম বা অবিচার করেন না। মানুষ নিজেই নিজের ওপর অবিচার করে। আল্লাহ বলেন, **"নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন।"** [সূরা আন-নিসা ৪ : ৪০]

৫. ইসলাম পর্দার আড়ালে রেখে নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে ?

উত্তর: "ইসলামে নারীর মর্যাদা"- ধর্মহীন প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর্যপুরি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল- 'হিজাব' বা ইসলামী পোশাক বা পর্দা। ধর্মীয়ভাবে নারীর জন্য রক্ষণশীল পোশাক বা পর্দা ফরয করার নেপথ্য কারণগুলো আলোচনার পূর্বে ইসলাম আগমনের পূর্বে বিশ্বসমাজে সামগ্রিকভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কি ছিল তা নিয়ে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

- ইসলাম-পূর্ব কালে নারীর-মর্যাদা বলতে কোনো ধারণার অস্তিত্ব ছিলনা। তারা ব্যবহৃত হতো ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে।

ইসলাম-পূর্ব সভ্যতাগুলোতে নারীর 'মর্যাদা' বলতে কিছুই ছিলনা। হীন নীচ এমনকি নুন্যতম 'মানুষ' হিসেবেও তারা গণ্য ছিল না।

- **মিসরীয় সভ্যতাঃ** মিসরীয় সভ্যতায় নারী 'ডাইনী' এবং শয়তানের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতো।
- **ইসলাম পূর্ব আরবঃ** ইসলাম পূর্ব আরবে নারীর অবস্থান ছিল ঘরের অন্যান্য ব্যবহারীক আসবাবপত্রের মতো। অনেক পিতা অসম্মানের হেতু হিসেবে তার কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দিত।
- **ইসলাম আসার পর:** ইসলাম নারীকে ওপরে উঠিয়েছে। তাদেরকে দিয়েছে ন্যায্য অধিকার ও উপযুক্ত সম্মান ।

পুরুষের পর্দাঃ মানুষ সাধারণত পর্দা নিয়ে আলোচনা করে নারীদের ক্ষেত্রে। অথচ জ্যোতীর্ময় কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা বলেছেন।

সূরা নূরে বলা হয়েছে- **"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। "** [সূরা আন-নুর ২৪ : ৩০]

যে মুহূর্তে কোনো পুরুষ একজন নারীর দিকে তাকাবে- লজ্জাকর অশণ্টীল চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। কাজেই তার দৃষ্টি অবনত রাখাই তার জন্য কল্যাণকর।

নারীর জন্য পর্দাঃ সূরা নূরের পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছেঃ **"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের**

www.QuranerAlo.com

গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" [সূরা আন-নুর ২৪ : ৩১]

১. হিজাব বা পর্দা অহেতুক উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে

নারীকে কেন পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে কুরআন তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সূরা আহ্যাবে বলা হয়েছেঃ **"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের[৭৮] কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** [সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৫৯]

জ্যোতির্ময় কুরআন বলছেঃ নারীকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, তারা যেন রুচিশীলা পরিচ্ছন্ন নারী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এবং এটা তাদেরকে লজ্জাকর উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবে।

২. দু'টি জমজ বোনের উদাহরণ

ধরা যাক জমজ দু'টি বোন। উভয়ই অপূর্ব সুন্দরী। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন পরেছে ইসলামী হিজাব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহ আবৃত। অন্যজন পরেছে পশ্চিমা পোশাক। শরীরের অধিকাংশ খোলা এবং প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ অর্থাৎ মডার্ন পোশাক। সামনেই এক মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে একদল খারাপ যুবক। মেয়েদেরকে দেখে হৈ-হুল্লাহ করা, শীশ দেয়া আর বাগে পেলে উত্ত্যক্ত করাই তাদের কাজ। এখন এই দুই বোনকে যেতে দেখে তারা কাকে উদ্দেশ্য করে ইভটিজিং/উত্যক্ত করবে ? শীশ দেবে? যে মেয়েটি নিজেকে ঢেকে রেখেছে তাকে দেখে? না যে মেয়েটি প্রায় আবেদনময়ী (অর্ধনগ্ন) হয়ে আছে তাকে দেখে? খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চোখ যাবে তার দিকে যে আবেনদময়ী পোশাক পড়েছে। কার্যত এ ধরনের পোশাক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি 'ভাষাহীন নিরব আমন্ত্রণ' ও আবেদনময়ী। যে কারণে বিপরীত লিঙ্গ উত্তেজিত হতে বাধ্য হয়। অতএব জ্যোতির্ময় কুরআন যথার্থই বলেছে- **'হিজাব নারীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে'**।

৩. নারী ধর্ষণের হার আমেরিকায় সর্বোচ্চঃ

উন্নত বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিদিন সংঘটিত নারী ধর্ষণের হার সারা বিশ্বে তার রেকর্ড কেউ স্পর্শও করতে পারবে না। ১৯৯০ সালের এফবিআই-এর দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১৭৫৬ টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। আবার একটা কাল্পনিক দৃর্শ্যপট পর্যবেক্ষণ করা যাক- আমেরিকান নারী সমাজ ইসলামী হিজাব পালন করছে। যখনি কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে, কোনো অশণ্টীল চিন্তা মনে এসে যেতে পারে ভাবার সাথে সাথে সে তার দৃষ্টিকে নীচে নামিয়ে নিচ্ছে। পথে ঘাটে যেখানেই কোনো নারী

---

৭৮ জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

বের হচ্ছে পরিপূর্ন হিজাব (পর্দা) সহকারে। তদুপুরি রাষ্ট্রীয় বিধান এমন যে, যদি কোনো পুরুষ ধর্ষণের অপরাধ করে তার জন্য নির্দিষ্ট-জনসমক্ষে প্রকাশ্য মৃত্যুদন্ড/শিরচ্ছেদ।

এবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, গোটা পরিবেশটা যদি সত্যি সত্যিই এমন হয় তাহলে আমেরিকার এই নারী ধর্ষণের ভয়ঙ্কর হার বাড়তে থাকবে না একই অবস্থানে থাকবে? নাকি কমে যাবে এবং কমতে কমতে একদিন এই জঘন্য অপরাধ নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্যই কমবে। কারণ মানুষ যখন জানবে ধর্ষণ করলে মৃত্যুদন্ড/শিরচ্ছেদ করা হবে তখন তারা সেই ভয়ে ধর্ষণ করবে না। এটাই স্বাভাবিক। আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইসলাম কেন নারীকে হিজাব/পর্দা করতে বলেছে।

৬. মুসলিমদের অনেকেই মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কেন ?

উত্তরঃ আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিরামহীনভাবে ইসলামবিরোধী প্রচারের প্রতিটি মাধ্যম থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসংখ্য ভুল তথ্য ও মিথ্যা রটনা করে মুসলিমদেরকে বর্বর হিসেবে চিহ্নিত করে এবং অন্যান্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে ।

আসুন এবার সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের অভিযোগ দুটি পর্যালোচনা করে দেখি।

ক. মৌলবাদী শব্দটির সংজ্ঞা

মৌলবাদী এমন এক ব্যক্তি যে অনুসরণ ও আনুগত্য করে কোন চিন্তা বিশ্বাসের মৌলনীতি ও শিক্ষা সমূহকে। কেউ যদি ভালো ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং কঠোর অনুশীলন করতে হবে ঔষধের মূল কার্যকারিতার ওপর। অন্য কথায় তাকে হতে হবে ঔষধী জগতের একনিষ্ঠ মৌলবাদী।

খ. একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে আমি গর্বিত:

আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম। আল্লাহর অসীম কৃপায়-জানি, বুঝি এবং চেষ্টা করি ইসলামের মূলনীতি সমূহকে অনুশীলন করতে। আল্লাহতে সমর্পিত কোনো একজন মৌলবাদী মুসলিম আখ্যায়িত হতে আদৌ লজ্জিত হবে না। একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে আমি গর্বিত এবং নিজেকে ধন্য মনে করি কারণ আমি জানি ইসলামের মৌলনীতি সমূহ বিশ্বমানবতার জন্য শুধুই কল্যাণকর। পৃথিবীর জন্য তা আশির্বাদ স্বরূপ। ইসলামের এমন একটি মূলনীতিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যা বিশ্বমানবতার জন্য ক্ষতিকর অথবা সামগ্রীকভাবে মানবতার স্বার্থের প্রতিকূলে।

গ. প্রত্যেক মুসলিমের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত !

হায় একি বলছেন !'সন্ত্রাসী' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এমন এক লোকের জন্য যে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসী তো তাকেই বলে যে

ত্রাস বা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যখনই কোনো ডাকাত একজন পুলিশকে দেখে- সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য 'সন্ত্রাসী'। এভাবেই চোর-ডাকাত, ধর্ষণকারী, বদমাশ তথা সমাজ বিরোধী সকল দুষ্কৃতকারীর জন্য একজন মুসলিমকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী 'সন্ত্রাসী' হতে হবে। যখনই সমাজ বিরোধী কোনো বদমাশ একজন মুসলিমকে দেখবে সে যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। একজন সত্যিকারের মুসলিম 'সন্ত্রাসী' হবে 'অপরাধীদের' জন্য-নিরীহ সাধারণ জনগণের জন্য নয়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আমি কি বুঝাতে চেয়েছি।

ঘ. প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা?

মিডিয়া সহ সকল বিধর্মীদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত করানো। কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা নিজেরাই দেখে নিন ।

- হিটলার, একজন অমুসলিম। ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছিলো। মিডিয়া একবারও তাকে বলেনি সে খ্রিস্টান টেররিস্ট!
- আর জজ বুশ ইরাকে,আফগানিস্থানে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে ! কই বিশ্ব মিডিয়া তো তাকে বলে না খ্রিস্টান টেররিস্ট !
- আর "হায়দ্রাবাদের কসাই" নামে পরিচিত "নরেন্দ মোদি" শত শত মুসলিম নিধন করেছে সবাই জানে ! তবুও মিডিয়া বলে না যে সে হিন্দু টেররিস্ট বা সন্ত্রাসি।
- এখনো মায়ানমারে প্রতিদিন মুসলিম রোহিঙ্গাদের খুন,ধর্ষণ, লুটপাট, উচ্ছেদ করছে ! তবুও কোনো মিডিয়া বলে না বৌদ্ধরা টেরোরিস্ট বা সন্ত্রাসি !

ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় বড় গনহত্যা করেছে নন মুসলিমরা আর তারা দিন-রাত গণতন্ত্র জপ করে মুখে ফেনা তুলে! অথচ এদের দ্বারা মানবতা লুন্ঠিত !

একটু ভাবুনতো :

১. যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল, তারা কি মুসলিম ছিল?
২. যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল, তারা কি মুসলিম ছিল?
৩. যারা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করেছিল, তারা কি মুসলিম ছিল? (যাচাই করুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর)। উত্তর কি?

উত্তর হবে, এসব মহাসন্ত্রাসী ও অমানবিক কার্যকলাপের সাথে মুসলিমরা কখনো জড়িত ছিলনা। আপনাকে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। যখন কোন কাফির (অবিশ্বাসী) সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে, তখন এটাকে বলা হয় অপরাধ। আর যখন কোন মুসলিম কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) সন্ত্রাস থেকে বাচাঁর জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, তখন তারা এটাকে তারা বলে বেড়ায়

www.QuranerAlo.com

ইসলামীয় সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদ! আজবতো ! ভেবে দেখছেন কি? বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে মুক্তিকামী মুজাহিদীনরা মুসলিম উম্মাহকে নির্যাতিত হওয়া থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছেন, কাফিরদের কাছে তারাই সন্ত্রাসী।[৭৯]

৭. মুসলিমরা বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত কেন? তাহলে কোন দলটি জান্নাতে যাবে ?

উত্তর: ইসলামে দলাদলি করা নিষিদ্ধ, তারপরও কিছু নামধারী মুসলিম দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা মুসলিমদের একতাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । আর মুসলিমদের শুধুমাত্র একটি দলই জান্নাতে যাবে যার পরিচয় আমরা এখন জানব ।

নাজাতপ্রাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) দল বলতে বুঝায় যে দলটি হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং জান্নাতে যাবে যার সম্পর্কে নবী ﷺ হাদিসে বলে গেছেন। আমরা এখানে সে দলের গুণ/বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট দলীল দ্বারা আলোকপাত করব ইনশা-আল্লাহ।

১। আল্লাহ ﷻ বলেন : **"আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো ও বিভক্ত হয়ে যেয়ো না।"** [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩]

২। অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন : **"যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে- প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উল্লসিত।"** [সূরা রূম, ৩০: ৩২]

৩। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন : *আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার, শোনা ও মান্য করার, যদিও তোমাদের আমীর হয় কোন হাবশি দাস। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা নানা মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের করণীয় হবে, আমার সুন্নত এবং হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের[৮০] সুন্নতকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া। সেসব সুন্নতকে মজবুতভাবে, চোয়ালের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার ন্যায় আঁকড়ে ধরবে। দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন আমল সংযোজনের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকবে; নিশ্চয় সমস্ত নতুন আমলই বিদআত এবং সমস্ত বিদআতই গোমরাহী এবং সমস্ত গোমরাহী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।*[৮১]

৪। নবী করিম ﷺ আরও বলেছেন, *ওহে! তোমাদের পূর্বে আগত আহলে কিতাব (ইয়াহুদি ও নাসারা/খ্রিস্টান)-রা ৭২ ফিরক্বা/দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। ৭২ ফিরক্বা/দল যাবে জাহান্নামে এবং একটি মাত্র ফিরক্বা/দল প্রবেশ করবে জান্নাতে। তারাই হলো আল-জামাআহ।*[৮২] *যখন ঐ জাহান্নামী ফিরক্বা/দলগুলোর*

---

৭৯ সূত্র: "ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব" লেখকঃ ডঃ জাকির নায়েক-ঈষৎ সংযোজিত ও সম্পাদিত ।

৮০ অর্থাৎ চার খলিফা। আবু বকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه, ওসমান رضي الله عنه ও আলী رضي الله عنه।

৮১ আবু দাউদ : ৪৬০৭ সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫ সুনানে নাসাঈ ১৫৭৮।

৮২ সুনানে আবু দাউদ ৪৫৯৭, সুনানে দারেমী ২৫৬০।

www.QuranerAlo.com

দাওয়াত ব্যাপক হবে, তখন আল-জামাআহকে আঁকড়ে থাকা সম্পর্কে হুযায়ফা ؓ-কে নবী ﷺ বলেছেন, তুমি মুসলিমদের "আল-জামাআহ" ও তাদের ইমামকে শক্তভাবে ধরে রাখবে (অর্থাৎ আল-জামাআহ এর সুস্পষ্ট পরিচয় হলো জামাআতুল মুসলিমীন বা মুসলিমদের জামাআহ[৮৩])। হুযায়ফা ؓ বললেন, সে সময় যদি কোন মুসলিম জামাআহ বা তাদের ইমাম না থাকে (তখন আমাকে কি করতে হবে)? তিনি বললেন, তখন তুমি বিচ্ছিন্ন দলের সবগুলোকেই পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকর চিবিয়ে জীবনধারণ করতে হয় এবং তুমি এ অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল ফিরক্বা সমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে এতে যে কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হতে পারে)।[৮৪]

অন্য হাদীসে নবী করিম ﷺ বলেন, *"আমি এবং আমার সাহাবীদের মতের (পথের) অনুসারী দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে।"[৮৫]*

৫। ইবনে মাসউদ ؓ হতে বর্ণিতঃ (তিনি বলেন) *"আমাদের জন্য নবী করিম ﷺ একটি দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এটা আল্লাহর সোজা (সঠিক) রাস্তা। তারপর তার ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এ রাস্তাগুলোর সবকটিতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে।[৮৬] এরপর তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন:* **"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"**- [সূরা আনআম ৬: ১৫৩]।

৬. নাজাতপ্রাপ্ত দল/মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলতে সে দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূল ﷺ এর জীবিত থাকা কালে তাঁর রাস্তাকে/মতকে/পথকে আঁকড়ে ধরেছেন দৃঢ়ভাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে গেছেন, *"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় (জিনিস) রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ (আদর্শ)"*।[৮৭]

৭. নাজাতপ্রাপ্ত দলের আরো একটি পরিচয় হলো, সর্বক্ষেত্রে তারা তাওহিদকে অগ্রাধিকার দেয়। তাদের সব কথা ও কাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের বিকাশ ঘটে, কেবল তাঁরই ইবাদাত করে, তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে তাঁকেই ডাকে, তাঁর নামেই যবেহ করে, নযর দেয়/মান্নত করে এবং তাঁর

---

৮৩ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ ؓ বলেন, জামাআহ বলা হয় যা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও তুমি হক্বের অনুসারী একাই হও। [বায়হাকি ফিল মাদখাল, গৃহিত শায়খ আব্দুল আজীজ আল রশিদ, আত্তানবিহাত আসসানিয়াহ] কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বর্গই আল-জামাআহ। চাই তিনি একক ব্যক্তি হন বা তাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠি হন।

৮৪ সহীহ বুখারি ৩৬০৬, ৭০৮৪ সহীহ মুসলিম ১৮৪৭।

৮৫ সুনানে তিরমিযী ২৬৪১ (হাসান)।

৮৬ সুনানে কুবরা নাসাঈ ১১১০৯, সহীহ ইবনে হিবব্বান : ৬, মুসনাদে আহমাদ ৪১৪২।

৮৭ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ৩, ৩৩৩৮, ১৮৭৪, মিশকাত ১৮৬, সিলসিলা সহীহাহ ১৭৬১।

উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে। ইবাদাত-বন্দেগী, বিচার-আচার, লেন-দেন এক কথায় জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ প্রবর্তিত শরীয়ত অনুযায়ী সম্পাদন করে।

৮. এ দল ইবাদাত, চরিত্র গঠন ও যাবতীয় কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সুন্নতকে জীবিত করে। ফলে নিজেদের সমাজে তারা (স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের নান্দনিকতায়) অপরিচিত-অচেনার মতো হয়ে যায় এবং এরা সংখ্যায় খুবই কম। এদের সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: *"ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত এর মতো এবং আবার ফিরে আসবে অপরিচিত এর মতো যেমন শুরুতে ছিল। সেই (গুরাবা) অপরিচিতদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ"*।[৮৮]

৯. নাজাত প্রাপ্ত/মুক্তিপ্রাপ্ত দল ইসলাম ও শরীয়ত পরিপন্থী মানবরচিত আইন ও বিচারের বিরোধিতা করে। বরং এরা মানব জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিতাব অনুযায়ী বিচার কায়েম করার প্রতি আহ্বান করে। আর এতেই রয়েছে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। কারণ এটি মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান। তিনিই জানেন কীসে তাদের কল্যাণ আর কীসে অকল্যাণ। তাছাড়া এ কিতাব অপরিবর্তনীয়- সময়ের বিবর্তনের সাথে কখনই এর পরিবর্তন হবে না। এটি সর্ব কালের সর্ব-শ্রেণির লোকদের জন্য প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বমানবতা বিশেষ করে মুসলিমদের দুর্ভোগ ও পেরেশানির অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত অসার সংবিধানে বিচারকার্য পরিচালনা করছে। জীবনাচারে কুরআন ও সুন্নাহর অনুবর্তন অনুপস্থিত। তাদের অপমান-অপদস্থ হবার এটিই মূল কারণ। এ অবস্থার পরিবর্তন কখনই হবে না যদি না তারা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার দিকে ফিরে আসে। ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্টিগতভাবে। সামাজিকভাবে হোক কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে।[৮৯]

অতএব উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের দলীল থেকে নাজাতপ্রাপ্ত/মুক্তিপ্রাপ্ত দলের যে বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম তার সারমর্ম/মূলকথা হলো:

- তারা আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হবে। তারা সর্বাগ্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার চার খলিফার আদর্শের/মতের/পথের অনুসারী।
- তারা মানুষকে সর্বাগ্রে তাওহীদের দাওয়াত দিবে এবং তাওহীদকে প্রাধান্য দিবে। তারা সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইবাদাত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনে সবচেয়ে বেশি ওহীর বিধানকে প্রাধান্য দিবে। তাগূতী বিধানকে বর্জন করবে।
- তারা সমস্ত বিদআতকে পরিহার করে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধওে জামাআতবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তারা দলে দলে বিভক্ত হবে না বরং

৮৮ সহীহ মুসলিম ১৪৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৮৬।

৮৯ মূল: মুক্তিপ্রাপ্তদলের পথ নির্দেশিকা- শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামিল জাইনূ তা:পা: পৃ: ৬-১২। সংক্ষেপিত,সংযোজিত ও ঈষৎ পরিমার্জিত

www.QuranerAlo.com

জামাআতবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যদিও তাদের সংখ্যা খুব কম/নগণ্য হয়। তারা সমাজের মধ্যে গুরাবা/অপরিচিত/অচেনা বা আগন্তুকের মতো থাকবে।

আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা আমাদেরকে ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত করুন।

দশম অধ্যায়ঃ

আহবান ! কীসের আহবান ?

আহ্বান শিশিরে ভেজা এতটুকু একটা ঘাসফুলের নাম- এরকম হতচ্ছাড়া পারিপার্শ্বিকতার মাঝেও সে পথচলার প্রেরণা দেয়। পথ যদি মুছে যায়ও, পথিকের অন্তরআত্মার আহবান নেভে না আদৌ। কারিগর স্বয়ং যেখানে হৃদয়ে তাঁর চেতনা বসিয়ে দিয়েছেন, সেই চেতনার ডাক অগ্রাহ্য করার আমি কে? আমাদের বিশ্বাস, সত্যিকার অর্থে কান পাতলে স্রষ্টার সেই শাশ্বত ডাক আজও শোনা যায়। আপনি কি স্রষ্টা, সৃষ্টি, মহাবিশ্ব, সমাজ, জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্ম, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে বা কথা বলতে চান? কোনরকম গোঁড়ামি, দলীয়করণ থেকে দূরে থেকে শুধুমাত্র সত্যকে বুঝতে বা অনুভব করতে চান? তাহলে আপনি যে ধর্মের বা মতেরই হোন না কেন- আমাদের আহবান আপনার অপছন্দ হওয়ার কথা নয়।

আহবানটা তবে কীসের ??? আহ্বান নির্ভরতার-নতুন করে পথ চলার, পথ গড়ে নেওয়ার! মানব সভ্যতার শুরু থেকেই রাতের বেলা আকাশের অগণিত তারার মেলার দিকে তাকিয়ে মানুষ ভেবে গিয়েছে সৃষ্টির রহস্য নিয়ে।

কেউ হয়ত শুয়ে ছিল গাছের ডালে, কেউ হয়ত বসে ছিল গুহার মুখে হাঁটুর উপর মুখ রেখে, কেউ হয়ত মরুর খোলা আকাশের নিচে শুয়ে ছিল আর তার পাশে ঘুমোচ্ছিল তার উট আকাশের পানে চেয়ে সবার মাথায় খেলছিল একই কথা একই জিজ্ঞাসা একই চিন্তা।

আমি কে?

কোথা থেকে এলাম?

কেন এলাম?

কে পাঠাল আমাকে ?

আর কোথায়ই বা যাব আমি?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরেছে সে বিশ্বাস করে নিয়েছে নিজের চেয়ে অনেক ক্ষমতাধর এক সত্ত্বার, কখনও তাঁকে ডেকেছে "স্রষ্টা" বলে, কখনো 'দেবতা' বলে, কখনও বা 'ঈশ্বর' বলে। করে গিয়েছে সে সত্ত্বার উপাসনা (ইবাদাত)।

কখনও হয়ত কালের পরিক্রমায় সেই "এক" সত্ত্বার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়েছে বহু সত্ত্বা। তখনই তার কাছে এসে পৌঁছেছে স্রষ্টার বাণী এক স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের বাণী তথা সত্যের প্রতি আহবান। আবার, কখনও কখনও সে বিচ্যুত হয়েছে সে বাণী থেকে,

যে ব্যক্তি সেই শাশ্বত আহবান পরিত্যাগ করেছে , তবে তার জন্য তা মোটেও মঙ্গল বয়ে আনে নি ।

এক মানব-মানবী যুগলের বহু সন্তান এই মানবজাতি এক স্রষ্টার আহবানে এগিয়ে গিয়েছে অনেকবার, পিছিয়েও এসেছে অনেকবার। কিন্তু কখনই আহবান-শূন্য হয়নি এ জাতি।

যেখানেই আঁধার সেখানেই আলোর মত ছুটে এসেছেন মুক্তির দূতগণ (নবী-রাসূলগণ), স্রষ্টার মেসেজ (বার্তা) নিয়ে হাজির হয়েছেন তাঁরা। শত কষ্ট সহ্য করে হলেও মানুষকে আহবান করে গেছেন সত্যের পথে, মুক্তির পথে, কল্যাণের পথে । তাদের আহ্বানের কল্যাণেই মানুষ দেখেছে এক মহাপণ্ঢাবনের পরেও কুঁড়ি থেকে ফুল ফোঁটার মত সভ্যতার উন্মেষ, দেখেছে লোহিত সাগর দু'ভাগ হয়ে স্রষ্টার কৃপা পাওয়া এক জাতির মুক্তি, দেখেছে অনেক মহামানবের আগমন।

কত শত সংস্কারককেই না দেখেছে এই দুনিয়াবসী। আর সর্বশেষে দেখেছে মুক্তির অগ্রদূত মরুভাস্কর "মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে" (শান্তি আর দোয়া বর্ষিত হোক তাঁর উপর)। দয়াময় স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা সর্বশেষ মুক্তির দূত (বার্তাবাহক) নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আহবান ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি। মানবজাতির প্রতি করুণা হিসেবে তাঁর আগমন। তাঁর আগমন শান্তির ইসলাম নিয়ে।

নবীর সাহাবীরা "আল্লাহকে" না দেখে ও নবীকে নিজেদের চোখে দেখে বিশ্বাস করেছেন। তাহলে, চিন্তা করুন তো, যে মানুষগুলো "আল্লাহকে"এবং তার প্রেরিত নবীকে না দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস এনেছে, তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছে, তারা কতটা বেশি মর্যাদা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে ??? ভেবে দেখেছেন কি???

আপনি কি পারবেন না তাদেরই একজন হতে? আহবানে সাড়া দিতে? তবে বসে রইলেন কেন? উঠে আসুন আপনার স্রষ্টার দিকে, প্রতিপালকের দিকে।

আহ্বানটা কীসের??

সত্য পথের আহ্বান। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান।

আপনাকে দিয়েই তাহলে আহ্বান শুরু করি। আপনি কি আপনার স্রষ্টা/প্রতিপালককে স্মরণ করেন সারা দিনে? যদি না করেন, তবে বলি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কতক্ষণই বা লাগবে? মাত্র আধা ঘণ্টা? পৌনে এক ঘণ্টা? খুব কি বেশি সময়?

নাকি আপনাকে এত সব সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরেও, প্রিয় মানুষগুলোর এত্ত এত্ত ভালোবাসা পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া সত্ত্বেও আপনার স্রষ্টাকে স্মরণ করতে রুচিতে বাঁধে আপনার ?

আহ্বানটা থাকলো আপনার জন্য, ভেবে দেখবেন ।

ইনশা-আল্লাহ, "আহবান" আপনাকে পথ দেখাবে ।

হে মানুষ! একবার ভেবে দেখ তোমার এ জীবনটা কার দেওয়া ? কিভাবে তুমি দুনিয়ায় এসেছ ? অথচ ইতিপূর্বে তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। তোমার মায়ের গর্ভে একটি পানি-বিন্দু থেকে তোমার জন্ম। কে তোমাকে সেখানে মানুষের রূপ দান করল? কে তোমাকে সুন্দর অবয়ব ও উন্নত রুচি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালো ? কে তোমার ঐ ছোট্ট জড় দেহে আত্মার সঞ্চার করল ? আবার কে ঐ আত্মাকে তোমার দেহ থেকে বের করে নিয়ে যাবে ? দুনিয়ার সকল শক্তি দিয়েও কি তুমি তোমার আত্মাকে তোমার দেহ পিঞ্জরে আটকে রাখতে পারবে ? ঐ রূহ যার হুকুমে এসেছে ও যার হুকুমে চলে যাবে তিনিই তো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যার কোন শরীক নেই। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করে তোমাকে অসহায়ভাবে দুনিয়ায় ছেড়ে দেননি। তিনি তোমার জীবনের চলার পথের বিধান সমূহ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। যাদের সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হে অবিশ্বাসী মানুষ! সবকিছুকে তুমি অবিশ্বাস করলেও নিজের সৃষ্টিকে ও নিজের আত্মাকে তুমি কি অবিশ্বাস করতে পারবে? দেহ থেকে রূহটা (আত্মাটা) চলে গেলে তুমি তো পোকার খোরাক হবে। কখনো কি ভেবে দেখেছ? তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তোমাকে শ্রবণশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে বহু শ্রবণ প্রতিবন্ধী (কানে শুনে না এমন লোক)। তোমাকে সুঠাম ও সুন্দর দেহ কে দিল ? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য পংগু, দুর্বল ও অসহায় মানুষ। তোমার সামনে রূযীর দুয়ার খুলে যাচ্ছে। অথচ তোমার বন্ধু শত চেষ্টায়ও তার অভাব মেটাতে পারছে না। অতএব তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক একজন আছেন। যিনি অদৃশ্যে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর নির্দেশনার বাইরে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই। যেমন পৃথিবী ও আকাশের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই। রোগ-শোক, বার্ধক্য-জ্বরা কিছুই ঠেকাবার ক্ষমতা তোমার নেই। সবই তোমার চোখের সামনে ঘটছে রাত-দিন। অথচ তোমার হুঁশ ফেরে না কোন দিন। কিন্তু কেন?

হে সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী (নাস্তিক) ! তুমি অবিশ্বাসের অন্ধগলি থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী হও। তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহ মেনে চল। অনুতপ্ত হয়ে একান্তে নিভৃতে চোখের পানি ফেলে তাঁর নিকটে ক্ষমা চাও। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। বিশ্বাস কর, যে সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) হুকুমে তুমি দুনিয়াতে এসেছ, সেই সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে

www.QuranerAlo.com

হবে। মনে রেখ ইসলাম ও পরিপূর্ণ ঈমান ব্যতীত এ পৃথিবীতে কোন মানুষ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) তোমাকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। এ পৃথিবীকে তাঁর প্রেরিত বিধান মতে সুন্দরভাবে আবাদ করার জন্যই তিনি তোমাকে বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আখেরাতে তোমাকে এ জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। অতএব তাঁর জৈবিক বিধানকে যখন তুমি অস্বীকার করতে পারছ না, তখন তুমি তাঁর নৈতিক ও সামাজিক বিধানকে কেন অস্বীকার করছ? আর সেকারণেই তো পৃথিবী আজ দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কাজে ভরে গেছে।

হে অবিশ্বাসী ! তুমি কি জানো সকল মানুষ জন্ম সূত্রে মুসলিম ও বংশসূত্রে মুসলিম? আদি পিতা আদম عليه السلام ছিলেন মুসলিম ও প্রথম নবী। তবে কেন আদি পিতার রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি অমুসলিম হয়েছ ? এতে তোমাকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের (নরকের) আগুনে পুড়তে হবে চিরদিন। তাই তো তোমার কথিত ধর্ম নেতারা (পাদ্রী-পুরোহিতরা) তোমার লাশকে দুনিয়ায় থাকতেই পোড়ানোর হুকুম দিয়েছে। তোমার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে তোমার মৃত মুখে আগুন দিতে বাধ্য করেছে। অথচ তোমার প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নিষ্ঠুর নন। তিনি তোমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে জানাযা শেষে স্ব-সম্মানে দাফন করতে বলেছেন। তুমি কি জানোনা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র (দ্বীন) ধর্ম হ'ল ইসলাম? বাকী সবই মানুষের মনগড়া ও অসম্পূর্ণ ধর্ম। যা ইহকাল ও পরকালে কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। ইসলামের পথ হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ। এর বাইরে সকল পথের মাথায় বসে আছে শয়তান। অতএব আল্লাহর পথ আর শয়তানের পথকে এক করে দেখ না। পরিণামে তুমি জাহান্নামী (নরকবাসী) হবে। তুমি কি পারবে সেদিন জীবন্ত আগুনে জ্বলতে ??? একটু ভেবে দেখোতো ।

হে ধর্ম নিরপেক্ষ! ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাসের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম, বিপণ্ডবের নাম, জীবনব্যবস্থার নাম। এ পথের বা জীবনব্যবস্থার বিধান সমূহ না মেনে মুসলিম হওয়া যায় না। আবু জাহেলরাও সৃস্টিকর্তা আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল। রাসূল ﷺ-কে সত্য বলে জানত। কিন্তু তারা ইসলামের বিধান সমূহে ও কুরআনের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করত মূলত ঃ তাদের পার্থিব স্বার্থ বিবেচনায়। তুমিও যদি তাই কর, তাহলে আবু জাহেলদের সাথেই তোমার হাশর হবে। অতএব সাবধান হও। মৃত্যু আসার আগেই তওবা কর। ফিরে এসো তুমি সত্যের পথে ।

www.QuranerAlo.com

Contents

অতএব হে সৃস্টিকর্তায় অবিশ্বাসী (নাস্তিক)! হে অস্বীকারকারী! হে ধর্মনিরপেক্ষ! ফিরে এসো সত্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পথে। মৃত্যুর আগেই অহংকার ও হঠকারিতা থেকে তাওবা করো। অবিশ্বাস ও কপটতার অন্ধকার থেকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের সরল পথে ফিরে এসো। ইসলামে ধর্মের (দ্বীনের) ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। কেননা সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসলামই সত্য, বাকী সবই বাতিল ও অগ্রহনযোগ্য। সত্যের পথ আলোকময়, মিথ্যার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক। অন্ধকার কখনো আলোকে গ্রাস করতে পারে না। বরং আলোই অন্ধকারকে দূরীভূত করে। জাহেলিয়াতের গাঢ় অমানিশা সাময়িকভাবে সমাজকে আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু সত্যের আলো জ্বলে উঠলে অন্ধকার নিমিষে পালিয়ে যায়। সত্য এসে গেছে আমাদের ও তোমাদের রব-"আল্লাহর" পক্ষ থেকে। যার আলো বিকশিত হচ্ছে দিকে দিকে। আর জয় সর্বদা আলোরই হয়ে থাকে। অতএব সত্যকে জেনেও যদি কেউ মিথ্যাকে বেছে নেয়, তবে সে তার ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারালো। মিথ্যায় গড়া জীবন কোন জীবন নয়, ওটা মরণ। পক্ষান্তরে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত জীবন হ'ল প্রকৃত জীবন। তার কাছে মানুষ পশু এমনকি পৃথিবীর সবকিছু নিরাপদ। কিন্তু মিথ্যার উপাসীদের কাছে তার নিজের জীবনও নিরাপদ নয়। নানা অপকর্মে সে নিজেকে শেষ করে ফেলে।

হে মানুষ ! তোমার সবকিছু ক্রিয়া-কর্ম তোমার রব (প্রভু) অদৃশ্য থেকে দেখছেন ও রেকর্ড করছেন এমন এক মেমরীতে যা আনলিমিটেড (অসীম)। তাঁকে লুকিয়ে তুমি কিছুই করতে পারো না। অতএব সাবধান হও। তাঁর ধৈর্য ও অবকাশ দানে তুমি ধোঁকা খেয়ো না। যেকোন সময় তাঁর প্রতিশোধ তোমার উপর নেমে আসবে। তখন আর তওবা করার সময় তুমি পাবে না। অতএব সাবধান হও! মনে রেখ আল্লাহ সত্য, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য, মৃত্যু সত্য, আখেরাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কেয়ামত অবশ্যই আসবে - এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব এসো চিরন্তন সত্যের আলোকে জীবন গড়ি। আর এটাই হ'ল প্রকৃত জীবন দর্শন, প্রকৃত জীবন-ব্যবস্থা, প্রকৃত সত্যের আহবান। আল্লাহ আমাদেরকে ইহজীবনে সেই আলোকিত সঠিক হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করুন- আমীন।

www.QuranerAlo.com

কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি বার্তা

প্রিয় পাঠক

এই বার্তার লক্ষ্য পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য আহবান জানানো এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে জানানো। আপনি জান্নাত (স্বর্গ) অথবা জাহান্নাম (নরক) কোনটি লাভ করবেন ? দয়া করে খেয়াল করুন, আপনি যখন এই বার্তাটি পড়া শেষ করবেন, আপনাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে যার নিকট ইসলামের বার্তা/দাওয়াত পৌঁছান হয়েছে, সুতরাং পরকালে কেয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে সৃষ্টিকর্তার নিকট এই মর্মে কোন অজুহাত পেশ করতে পারবেন না যে আপনি এ সম্পর্কে জানতেন না বা আপনার কাছে পৌছানো হয়নি।

লক্ষ্য করুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং উপাসনার যোগ্য। তিনি ব্যতিত আর কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই। তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি এবং তিনি কাউকে জন্মও দেননি।

- আল্লাহ বলেন,**"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।"** [সুরাঃ ইখলাস ১১২ ঃ ১-৪]

জেনে রাখুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি ব্যতিত আর কোন স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রণকারী নেই।

- আল্লাহ বলেন, **"তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই ; সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ ?"** [সুরাঃ গাফির ৪০ ঃ ৬২]

জেনে রাখুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য।

- আল্লাহ বলেন, **"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।"** [সুরা আয-যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৬]

বোঝার চেষ্টা করুন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতিত ইহজগতের কোন সৃষ্টির উপাসনা করা যাবেনা সেটা যাই হোক বা যে-ই হোক।

- আল্লাহ বলেন, **"নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে -মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ নিজেই বলেছিলঃ হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর! যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।"** [সুরাঃ মায়িদাহ ৫ ঃ ৭২]

www.QuranerAlo.com

Contents

জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদত করে, সে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে বা অন্য কাউকে শরীক করে যার ফলে তাঁর সমস্ত ভাল কাজ বরবাদ হয়ে যায় এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

- আল্লাহ বলেন,**"এটাই আল্লাহর হিদায়াত ; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত ।"** [সুরাঃ আল-আনআম ৬ ঃ ৮৮]

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ সমস্ত নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন মানুষকে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন (প্রকৃত) ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

- আল্লাহ বলেন,**"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি** (এ সংবাদ দিয়ে) **যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গুমরাহী, অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল!"** [সুরাঃ আন-নাহাল ১৬ ঃ ৩৬]

জেনে রাখুন, প্রত্যেক নবী ও রাসুলের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। যদি কেউ একজন নবী কিংবা রাসুলকেও অবিশ্বাস করে তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত নবী-রাসুলদের অবিশ্বাস করল।

- আল্লাহ বলেন,**"রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।"** [সুরাঃ আল-বাকারা ২ ঃ ২৮৫]
- আল্লাহ বলেন, **"যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে"**। [সুরা গাফির ৪০ ঃ ৭০]

জেনে রাখুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল যাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন সমগ্র বিশ্বজগতের সকল মানুষের জন্য রহমত হিসাবে। তিনি ছিলেন জান্নাত (স্বর্গ) এবং জাহান্নাম (নরক) এর বার্তাবাহক। তিনিই সর্বশেষ নবী-রাসুল (বার্তাবাহক)। তার পরে আর কোন নবী-রাসুল আসবে না।

- আল্লাহ বলেন, **"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।[৯০] আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"** [সূরা আল-আহযাব ৩৩ ঃ ৪০]

৯০ মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী; তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না-এ বিষয়টি আল-কুরআনের এই আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

Contents

জেনে রাখুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রেরণ করেছেন পবিত্র কুরআন যা হল মহান আল্লাহর বাণী এবং যা সঠিক পথের দিশারী (সন্ধান)।

- আল্লাহ বলেন,**"রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে"** [সুরাঃ আল-বাকারা ২ ঃ ১৮৫]
- আল্লাহ বলেন,**"নিশ্চয়ই তোমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।"** [সুরাঃ আন-নামাল ২৭ ঃ ৬]

লক্ষ্য করুন, আল-কুরআন সর্বকালের সেরা বিস্ময়। এটি সমগ্র মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে এর সমতুল্য একটি সূরা রচনা করার জন্য। চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতে পারবেন কি? আছে কি কেউ ?

- আল্লাহ বলেন,**"বলঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা।"** [সুরাঃ আল-ইসরা ১৭ ঃ ৮৮]
- আল্লাহ বলেন,**"আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর।"** [সুরাঃ বাকারা ২ ঃ ২৩]

জেনে রাখুন, আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে (বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে) আদেশ করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর বিশ্বাস আনার জন্য, রাসুলকে অনুসরণের জন্য, যে তা করবে সে ই সঠিক পথে থাকবে। আর যে তা করবে না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- আল্লাহ বলেন,**"যে রসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে** (জোরপূর্বক তাকে সৎপথে আনার জন্য) **আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি।"** [সুরাঃ আন-নিসা ৪ ঃ ৮০]

লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তি জানতে পারল যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল অথচ তাকে বিশ্বাস করল না এবং তাঁর অনুসারী হল না, সত্যকে অস্বীকার করল, সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী (কাফির), সে বিচার দিবসে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

- আল্লাহ বলেন,**"যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে - যেন ভূমন্ডলের সাথে তারা মিশে যায় এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা।"** [সুরাঃ আন-নিসা ৪ ঃ ৪২]
- মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, *"সেই মহান সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের কোনো ইহুদী, খৃষ্টান যদি আমার কথা*

শুনে, এরপর আমার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আগেই মারা যায়, তাহলে সে (নরকবাসী) জাহান্নামবাসী হবে।”[৯১]

জেনে রাখুন, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন (ধর্ম) হল ইসলাম। এটিই ছিল সকল নবী-রাসুলদের দ্বীন (ধর্ম)। এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন (ধর্ম) গ্রহন করা হবে না।

- আল্লাহ বলেন,-“আর এ বিষয়ে **ইব্রাহীম ও ইয়া'কূব স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছে- 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না”**। [সুরাঃ বাকারা ২ ঃ ১৩২]
- আল্লাহ বলেন, **“নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে,** (সে জেনে নিক) **নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর।”** [সুরাঃ আল-ইমরান ৩ ঃ ১৯]
- আল্লাহ বলেন,**“আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”** [সুরাঃ আল-ইমরান ৩ ঃ ৮৫]

জেনে রাখুন, মৃত্যুর পরবর্তি পুনরুত্থান বেশি দূরে নয় এবং তা চরম সত্য। ইহা অতি নিকটবর্তী এবং তা অবশ্যই আসবে।

- আল্লাহ বলেন, **“যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস! সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর।' তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! ”** [সুরাঃ আল-আনআম ৬ ঃ ৩১]
- আল্লাহ বলেন,**“ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক** (তা) **বিশ্বাস করে না।”** [সুরাঃ গাফির ৪০ ঃ ৫৯]
- আল্লাহ বলেন, **“কাফিরগণ বলে- ক্বিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। বল, না, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্য অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর থেকে লুক্কায়িত নেই আকাশ ও পৃথিবীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকণা, না তার থেকে ছোট আর না তার থেকে বড়** (কোনটাই নেই লুক্কায়িত)। **সবই আছে** (লাওহে মাহফুয নামক) **এক সুস্পষ্ট কিতাবে।।”** [সুরাঃ সাবা ৩৪ ঃ ৩]

জেনে রাখুন, জান্নাত[৯২] (স্বর্গ) এবং এর নিয়ামত চরম সত্য। জান্নাতে এমন কিছু আছে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি। জান্নাত চরম

৯১ মুসলিম হাদিস নং ১৫৩ মুসনাদে আহমাদ ৮২০৩ ।
৯২ জান্নাত জাহান্নাম সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পড়ুন “জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা”-লেখক ইকবাল কিলানি।- তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বংশাল, ঢাকা।

সুখময় স্থান যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহর মু'মিন (বিশ্বাসি) বান্দাদের জন্য, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

- আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে, আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদে বাসস্থান দেব যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তার ভেতরে তারা চিরকাল থাকবে। সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!" [সুরাঃ আল-আনকাবুত ২৯, আয়াতঃ ৫৮]
- আল্লাহ বলেন, "মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার উপমা হলঃ তাতে আছে নির্মল পানির ঝর্ণা, আর আছে দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তণীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ আর পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তাদের জন্য সেখানে আছে সব রকম ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা। (এরা কি) তাদের মত যারা চিরকাল থাকবে জাহান্নামে যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে গরম পানীয় যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে?" [সুরাঃ মুহাম্মাদ ৪৭, আয়াত ঃ ১৫]
- আল্লাহ বলেন,"তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দেন যাকে ইচ্ছে করেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।"[সুরাঃ.আল-হাদিদ ৫৭,আয়াতঃ ২১]

জেনে রাখুন, জাহান্নাম (নরক) চরম সত্য। এর আযাব ভয়াবহ এবং অসহনীয়। জাহান্নাম এমন এক জায়গা যা কেউ কখনো দেখেনি। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের জন্য এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে (যেমনঃ খ্রিষ্টানরা ঈসা [عليه السلام]-কে ঈশ্বরের পুত্র মনে করে, কিছু নামধারী মুসলিমরা কবর/মাযারে সেজদা করে যা শিরক, হিন্দুরা বিভিন্ন দেবদেবী/প্রতিমার পুজা করে, যদিও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে তা নিষিদ্ধ)।

- আল্লাহ বলেন, "কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। তখন জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে- তোমাদের কাছে তোমাদেরই ভিতর থেকে কি রসূলগণ আসেননি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পড়ে শোনাতেন আর তোমাদেরকে যে এ দিনের সাক্ষাৎ করতে হবে এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা বলবে- হাঁ, এসেছিল। কিন্তু (এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও) কাফিরদের প্রতি শাস্তির ফয়সালা অবধারিত হয়ে গেছে।" [সুরাঃ যুমার ৩৯, আয়াতঃ ৭১]
- আল্লাহ বলেন, "আর যারা কুফ্‌রী করে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা হবে না যে, তারা (নির্ধারিত সময় আসলে) মরে যাবে, আর তাদের থেকে শাস্তিও কমানো হবে না। প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।" [সুরাঃ ফাতির ৩৫, আয়াতঃ ৩৬]

লক্ষ্য করুন, আপনি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর বিশ্বাস এনে ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আপনি জাহান্নাম হতে রক্ষা পাবেন এবং জান্নাতবাসী হবেন এবং সেখানে চিরকাল থাকবেন।

- আল্লাহ বলেন,"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? আল্লাহ বলবেন, 'এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" [সুরা ঃ ত্বহা ২০, আয়াতঃ ১২৪-১২৬]
- আল্লাহ বলেন,"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।" [সুরাঃ আস-সাজদাহ ৩২, আয়াতঃ ২২]
- আল্লাহ বলেন,"তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি (দ্বীন) স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে ; তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।" [সুরা ঃ আল-বাকারা ২, আয়াত ঃ ২১৭]
- "হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ধোকা দিতে না পারে এবং মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় ফেলতে না পারে।" [সূরা লোকমানঃ ৩১: ৩৩]
- "কোন বহনকারী অন্যের (পাপের) বোঝা বইবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বয়ে দেয়ার জন্য অন্যকে ডাকে তবে তার কিছুই বয়ে দেয়া হবে না- নিকটাত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা না দেখেই তাদের প্রতিপালককে ভয় করে আর নামায প্রতিষ্ঠা করে। যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজের কল্যাণেই। আল্লাহর দিকেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন।" [সূরা ফাতিরঃ ৩৫ : ১৮]

জেনে রাখুন মৃত্যু আসবেই যেখানেই থাকুন না কেন ।

- "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর।" [সূরা নিসা ৪: ৭৮]

মানুষের প্রাণ হরণের দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আছে ।

- **"বল, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।"** [সূরা সেজদাহ: ৩২: ১১]

কিয়ামতের দিন অপরাধীরা বলবে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি ।

- **"তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে** (আর বলবে), **হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম; কাজেই আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা ভাল কাজ করব, আমরা** (এখন) **দৃঢ় বিশ্বাসী।"** [সূরা সেজদাহ: ৩২ : ১২]

সেদিন (কিয়ামতের দিন) কাফিরদের ঈমান কোন কাজে আসবে না ।

- **"বল, ফয়সালার দিনে** (সব কিছু দেখার পর) **কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন উপকার দিবে না, আর তাদেরকে কোন সময়ও দেয়া হবে না।"** [সূরা সেজদাহ: ৩২: ২৯]

- **"কাজেই** (শাস্তির) **স্বাদ গ্রহণ কর, কেননা এ দিনের সাক্ষাৎকে তোমরা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেছি। তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করতে থাক, তোমরা যা করছিলে তার কারণে।"** [সূরা আস সাজদাহঃ ৩২: ১৪]

.......জেনে রাখুন, ধর্মে কোন জবরদস্তি/বাড়াবাড়ি নেই। সঠিক পথ ও ভুল পথ দুটোই স্পষ্ট। সুতরাং, উপরের বার্তাটি পড়ার পর, চিন্তা-ভাবনা করার পর যদি সত্যকে অস্বীকার করেন, তাহলে আল্লাহর কাছে অজুহাত পেশ করতে পারবেন না। যেহেতু সকল নবী-রাসুলদের বার্তা আপনার নিকট আল-কুরআনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, কাজেই বিচার দিবসে আপনাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। বিচার দিবসে কোন টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি কাজে আসবেনা, বরং যারা মুসলিম হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সামনে সেদিন হাজির হবে, তারাই বিজয়ী হবে।

.... সবশেষে একটি কথা লক্ষ্য রাখবেন, শয়তান এবং যারা ইসলামবিরোধী কাজে নিয়োজিত তারা আমাদের সর্বদা এই মহান সত্য বার্তা হতে বিমুখ করে রাখবে।

.... আমরা মহান আল্লাহর নিকট দুয়া করি যাতে তিনি আপনাকে-আমাকে আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, সঠিক রাস্তা দেখান। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু, পালনকর্তা। তারই নিকট আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।

www.QuranerAlo.com

কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) প্রতি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর চিঠি

অবিশ্বাসীদের প্রতি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অসংখ্য পত্রসমূহ থেকে একটি পত্র নিচে উল্লেখ করা হলো:

হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশীর নামে-

.... 'এই চিঠি নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের নামে। যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করবেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন তার ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তার স্ত্রী পুত্র কিছু নেই। আমি একথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি কেননা আমি আল্লাহর রাসূল। কাজেই ইসলাম গ্রহন করুন, শান্তিতে থাকবেন।

.... "হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করব না। তার সাথে কাউকে অংশীদার করব না , আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করব না। যদি কেউ এ বিশ্বাস গ্রহনে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাকো, আমি মুসলিম (আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পনকারী)। যদি আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ না করেন তবে আপনার ওপর আপনার কওমের (জাতির/গোষ্ঠীর) নাছারাদের (খ্রিস্টানদের) সমুদয় পাপ বর্তাবে।[৯৩]

৯৩ সূত্র: তারিখে তাবারী-খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৬৫২ , যাদুল মা'আদ ৩য় খন্ড পৃ: ৬০ , রাসুল ﷺ যেভাবে তাবলীগ করেছেন- আহসানাউল্লাহ বিন সানাউল্লাহ পৃ: ৫২ ।

www.QuranerAlo.com

ইসলামের পথে চলার মজাই আলাদা !

যারা ইসলামের পথে চলেনি তারা আসলে বুঝবে না যে ইসলামের পথে চলার মজাই আলাদা। যেহেতু ইসলামই সঠিক দ্বীন (ধর্ম)। তাই ইসলামের উপর চললে মনে প্রশান্তি আসে। নিজ জীবন ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করলে জীবন হয় সুখের ও সাচ্ছন্দ্যময়। তারাই ইসলামের প্রকৃত শান্তি উপলব্ধি করতে পারবে যারা ইসলাম অনুযায়ী নিজ জীবন পরিচালিত করবে।

ইসলাম ছাড়া লাইফ ইমপসিবল !

বন্ধু ছাড়া লাইফ ইমপসিবল নয় বরং ইসলাম ছাড়া লাইফ ইমপসিবল! কারণ ইসলামেই রয়েছে বিশ্ব মানবতার সমাধান। ইসলামেই রয়েছে উত্তম বন্ধু স্বয়ং--- আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। যিনি তার বান্দাকে দয়া করেন ও ভালবাসেন। এমন কোন বন্ধুর সন্ধান আপনার কাছে আছে কি? যে ইহকালে (দুনিয়ায়) বন্ধু ,কবরের জীবনে বন্ধু, পরকালে (মৃত্যুর পরের জীবনে) বন্ধু। আছে এমন কেউ ? না , নেই! কিন্তু ইসলামই সর্বোচ্চ উত্তম বন্ধুর পরিচয় দেয়-আর তিনি মহান আল্লাহ তায়ালা। তিনিই মুমিনদের প্রকৃত বন্ধু। তিনিই এমন এক স্বত্তা যিনি ইহকালে (দুনিয়ার জীবনে) বন্ধু , কবরের জীবনে বন্ধু, পরকালে (মৃত্যুর পরের জীবনে) বন্ধু। আপনার দুনিয়ার বন্ধু আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা উত্তম বন্ধু তাকে ভালবাসলে,তার ইবাদাত করলে, তার সাথে কাউকে অংশীদার না করলে তিনি আপনাকে ছেড়ে যাবেন না। বরং আপানাকে সাহায্য করবেন ও সফল করবেন। তাই আসুন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করি।

www.QuranerAlo.com

সত্য আগত, মিথ্যা বিলুপ্ত ! মিথ্যাতো বিলুপ্ত হওয়ারই জন্য !

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

- "বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" [সূরা (ইসরা) বনী ইস্রাঈলঃ ১৭ : ৮১]
- "সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৩: ৬০]
- "যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ ? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে "। [সূরা আর-রাদঃ ১৩ : ১৯]
- "আর বলে দাও, 'সত্য এসেছে তোমাদের রবের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।' আমি (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।" [সূরা আল-কাহফঃ ১৮ : ২৯]
- "যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম'! তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'। 'হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশী করে লা'নত করুন'।" [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৩ : ৬৬ - ৬৮]
- "আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব দূর দিগন্তে (অর্থাৎ দূর পর্যন্ত ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হবে) আর তাদের নিজেদের মধ্যেও (অর্থাৎ কাফিররা নতজানু হয়ে ইসলাম কবূল করবে) যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সব কিছুরই সাক্ষী।" [সূরা হামিম আস-সাজদাহ ৪১ : ৫৩]
- "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। ইহা এক মহাসাফল্য" [সূরা ইউনুস ১০ :৬৪]

Contents

কবরে যে প্রশ্ন করা হবে!

এখানে আমি যা বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা মুমিন, কাফির-মুশরিক, পরহেজগার, ফাসিকসহ সকল প্রাপ্তবয়স্ক বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি দীর্ঘ হাদীস যা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি।

কবরে মুমিন বান্দাকে যে প্রশ্ন করা হবে:

"হুংকারকারী শক্তিশালী দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে প্রশ্ন করবে: তোমার রব কে? সে বলবে: আমার রব আল্লাহ। তারা বলবে: তোমার দ্বীন কী? সে বলবে: আমার দ্বীন ইসলাম। তারা বলবে: তোমাদের নিকট প্রেরিত এই লোকটি কে? সে বলবে: তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তারা বলবে: তুমি কীভাবে জানলে? সে বলবে: আল্লাহর কিতাব পড়েছি, এর ওপর ঈমান এনেছি এবং বিশ্বাস করেছি। তাকে ধরে জিজ্ঞেস করে বলবে: তোমার প্রভু কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? আর এটিই হবে মুমিন আত্মার ওপর অর্পিত শেষ ফিতনা। সে বলবে: আমার রব আল্লাহ, দ্বীন ইসলাম এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তখন আকাশ হতে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। তখন জান্নাত থেকে সুগন্ধির হাওয়া আসতে থাকবে এবং তার জন্য তার কবরকে চোখের শেষ দৃষ্টি পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তার নিকট সুশ্রী সুন্দর পোশাক পরিহিত একজন ফেরেশতা আসবে, অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তার বেশ ধরে এসে বলবে: তোমাকে আনন্দিত করবে এমন একটি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসীম শান্তি বিশিষ্ট জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

অপরদিকে কাফির, মুশরিক-ফাসিক, মুনাফিক বান্দাকে কবরে যে প্রশ্ন করা হবে:

"তার নিকট গম্ভীর দু'জন ফেরেশতা এসে ধমকাবে এবং তাকে বসিয়ে বলবে: তোমার রব কে? সে বলবে: হায়! হায়! আমি জানি না। তারা বলবে: তোমার দ্বীন কী? সে বলবে হায়! হায়! আমি জানি না। তারা বলবে: সেই লোকটি কে যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল? তখন সে তাঁর নাম স্মরণ করতে পারবে না। বলা হবে (তাঁর নাম কি) মুহাম্মাদ? সে বলবে: হায়! হায়! আমি জানি না; কিন্তু লোকজনকে এ নাম বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: তাকে বলা হবে, তুমি জাননি এবং যারা জেনেছে তাদের অনুসরণও করনি। তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন: সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও; যেন সেখান থেকে উত্তাপ ও প্রখর বাষ্প আসতে থাকে। অতঃপর তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তার বুকের হাড়গুলো একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যাবে। তারপর বিশ্রী মুখ বিশিষ্ট জীর্ণ কাপড় পরিহিত দুর্গন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি তার নিকট আসবে- অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তার বেশ ধরে বলবে, তুমি এমন একটি সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমার অনিষ্ট করবে। আজ সেই দিন যে দিনের অঙ্গীকার তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। সে বলবে: তুমি কে? তোমাকে আল্লাহ এমন দুঃসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন? তোমার চেহারা তো সেই চেহারা যা অনিষ্ট বয়ে আনে। সে বলবে: আমি তোমার মন্দ আমল। আল্লাহর কসম! তুমি তাঁর

www.QuranerAlo.com

আনুগত্যের প্রতি ছিলে অত্যন্ত নিশ্চল এবং তাঁর নাফরমানীর প্রতি ছিলে চতুর। সুতরাং আল্লাহ তোমার মন্দের যথাযথ প্রতিদান দিয়েছেন।" [৯৪]

সুতরাং এ হাদীস থেকে জানা গেল, যারা দ্বীনি ইলম (জ্ঞান) অর্জন করবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ (হাদীস) পড়বে, ইসলামি বই পড়বে, যারা সত্য জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নিবে এবং তা অনুযায়ী আমল করবে তারাই কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আর যারা শুনে শুনে অন্ধভাবে লোকে যা বলত তাই মানত, তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

কিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্ন করা হবে

দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে শুরু হবে আখিরাতের (পরকালের) অনন্তকালের জীবন। অন্ধকার কবরে অনন্তকালের এ জীবনের পর প্রত্যেক বান্দাকে হাশরের মাঠে মহান আল্লাহ পাকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এ সময় প্রতিটি মানুষকে ৫টি প্রশ্ন করা হবে।

এ প্রসঙ্গে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, *'কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দা তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে,*

১) তার বয়স কিভাবে অতিবাহিত করেছে ?
২) যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছে ?
৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে ?
৪) সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? ও
৫) তার জ্ঞান অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে। ? [৯৫]

৯৪ মিশকাত: ১৬৩০, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৩৪ ।
৯৫ তিরমিযি হাদিস নং ২৪১৭ ।

www.QuranerAlo.com

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।
ফিরে আসুন ইসলামের পথে

হে ভাই ও বোনেরা!

অতএব ফিরে আসুন ইসলামের পথে। রঞ্জিত হোন ইসলামের রঙে। ইসলামের রঙই উত্তম রঙ। ইসলামের রঙ অপেক্ষা উত্তম রঙ আর কোন দ্বীনের (ধর্মের) হতে পারে?

সতর্ক হোন, তাওবা করে ফিরে আসুন আল্লাহর পথে এবং স্মরণ করুন সেই দিনের কথা, যে দিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই থেকে, মাতা-পিতা থেকে, পত্নী ও সন্তানদের থেকে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এতটাই চিন্তিত থাকবে যে, সবচেয়ে আপনজনের কথাও কারো স্মরণে থাকবে না। সতর্ক হোন সে দিনের জন্য যেদিন ধনসম্পদ সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। সেদিন উপকারে আসবে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ তাওহীদযুক্ত ঈমান ও সুন্নাহসম্মত আমল। সুতরাং ফিরে আসুন হকের পথে। সত্যকে প্রত্যাখান করবেন না। আহ্বান করুন অপরকে। দাওয়াত দিন পূর্ণাঙ্গ তাওহীদযুক্ত ইসলামের। অটল থাকুন, ধৈর্য ধরুন। আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ।

.....হে আমার ভাই ও বোন.....আজ থেকেই না হয় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করুন এই বইটি মুসলিম-অমুসলিম,নাস্তিক নির্বিশেষে প্রতি ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতকে আরও বেগবান করে তুলুন। আর এই বইটি প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারেন সকল নবী-রাসূলদের দেয়া ইসলামের দাওয়াত তথা সত্যের আহবান, কল্যাণের দাওয়াত। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং ইসলামের দাওয়াতকে আরও প্রসারিত করার তাওফিক দান করুন [আমিন]

[বি:দ্র: বইটি পড়া হলে কোন অমুসলিমকে উপহার দিন অথবা এমন স্থানে রাখুন যাতে বইটি যে কেউ পড়তে পারে ও উপকৃত হতে পারে]

www.QuranerAlo.com

ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে জানতে

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই ও ওয়েবসাইটের তালিকা

১. “তাঈসিরুল কুরআন” পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত সহজ সরল ব্যাখ্যা “তাফসীর আহসানুল বয়ান”, তাওহীদ পাবলিকেশন। বংশাল- ঢাকা।

২. বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ সমূহ- বুখারি, মুসলিম আবূ দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি।----তাওহীদ পাবলিকেশন, হাদিস ফাউন্ডেশন, ইসলামিক সেন্টারের ।

৩. “বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ ”- ডাঃ জাকির নায়েক। পিস পাবলিকেশন। বাংলাবাজার , ঢাকা।

৪. “প্রসিদ্ধ ধর্মগুলোতে স্রষ্টার ধারণা”- ডাঃ জাকির নায়েক। তাওহীদ পাবলিকেশন। বংশাল- ঢাকা।

৫. “অভিযোগের জবাবে কুরআন ও বিজ্ঞান” ডাঃ শাহ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন।

৬. প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ, আরজ আলী সমীপে- আরিফ আজাদ।

৭. “আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান”-ডাঃ জাকির নায়েক। পিস পাবলিকেশন্স।

৮. “ইসলামি আক্বিদা”- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির। আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট।

৯. ‘কালিমাতুশ শাহাদাহ’- গাজী মুহাম্মাদ তানজিল। ইমাম পাবলিকেশন্স । সুরিটোলা ঢাকা ।

১০. “কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা”- মুহাম্মাদ সুলায়মান আত-তামিমী। তাওহীদ পাবলিকেশন। বংশাল- ঢাকা।

১১. “আর-রাহিকুল মাখতুম” সফিউর রহমান মুবারকপুরী- তাওহীদ পাবলিকেশন্স। সীরাতে ইবনে হিশাম ।

১২. “নবীদের কাহিনী (১ম ও ২য় খন্ড)” - ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব । হাদিস ফাউন্ডেশন।

১৩. www.islamhouse.com/bn/

১৪. www.islamqa.info/bn/

১৫. www.QuranerAlo.com

১৬. www.waytojannah.com/

১৭. www.hadithbd.com

Contents

মহান আল্লাহ বলেন- "আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।" [সূরা বাকারা ২ : ২৩, ২৪]

বইটি কেন পড়বেন?

- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানতে ও গবেষণা করার জন্য।
- সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন ।
- কুরআন আল্লাহর বাণী এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ।
- ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা।
- ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য।
- নাস্তিক, কাফির-মুশরিক এবং মুসলিম সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।
- বইটি দাঈ ভাইদের দাওয়াতের কাজের জন্য সহজ গাইডলাইন।